কিশোর চিলার
তিন গোয়েন্দা

টাইম ট্র্যাভেল

রকিব হাসান

'সময়-সুড়ঙ্গ' আর 'পিশাচকন্যা'র সেই
গোলকধাঁধাটার কথা মনে আছে তো–যাতে করে
নেকড়ের বন থেকে কিশোরকে উদ্ধার
করে এনেছিল তার বন্ধুরা?
আবার চড়ল তিন গোয়েন্দা সেটাতে।
কোথায় রয়েছে ওরা বুঝতে সময় লাগল।
মৃত্যু ঘুরছে পায়ে পায়ে।
বাঁচতে হলে দেহের সমস্ত লাল রক্ত বের
করে ফেলা ছাড়া গতি নেই।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

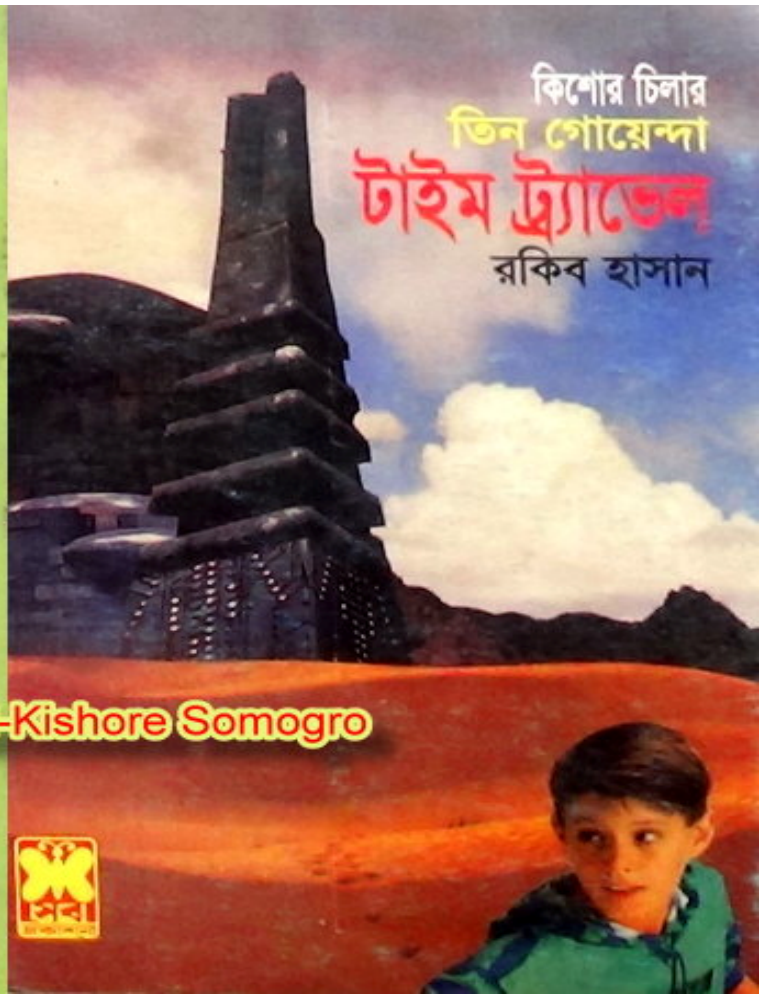

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro

টাইম ট্র্যাভেল

প্রথম প্রকাশঃ ২০০২

'অকারণে সময় নষ্ট করছি আমরা,' ফিসফিস করে বলল দু'জনের মধ্যে লম্বা লোকটা। তার নাম মাজুল। 'নতুন কিছুই আবিষ্কার করেননি ডক্টর স্টিভেনস। করলে এতদিনে জেনে যেতাম।'

'সব সময়ই বড় বেশি অধৈর্য তুমি, গাজুল,' তিরস্কার করল দু'জনের মধ্যে বেঁটে লোকটা।

ব্রেন স্পেশালিস্ট বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডক্টর জ্যাক স্টিভেনসের বাড়িতে লুকিয়ে আছে ওরা। রান্নাঘরের আলমারির আড়ালে রয়েছে এখন। তিনি নতুন কোন ফরমুলা আবিষ্কার করেছেন কিনা জানতে এসেছে। যদি করে থাকেন, হয় ফরমুলাটা চুরি করবে, নয়তো কপি করে নিয়ে যাবে।

'ফরমুলা যদি না-ই পাই, তাহলে আরেক কাজ করব,' গাজুল বলল। 'এসেছি যখন, একেবারে খালি হাতে ফিরব না। আর কিছু না হোক, মনিবের জন্যে কয়েকটা গোলাম ধরে নিয়ে যাব। কি বলো?'

'ঠিক, ভাল বুদ্ধি,' উল্লসিত হয়ে মাথা ঝাঁকাল মাজুল। 'কিন্তু বুদ্ধিমান গোলাম পাব কোথায়? শহরটার লোকজনকে দেখে বোঝা যাচ্ছে একেবারে আদিম অবস্থাতেই রয়ে গেছে এরা। বুদ্ধিশুদ্ধিও বড় কম। বেশি বোকা।'

'বোকারা কিন্তু ভাল গোলাম হয়,' গাজুল বলল। 'কথা শোনানো যায়।'

'তা বটে। কিন্তু বোকা লোক যে পছন্দ করেন না মনিব,' মাজুল বলল। 'যাকগে। আমার খিদে পেয়েছে।'

আলমারির আড়াল থেকে সে বেরোনোর উপক্রম করতেই খপ করে তার হাত চেপে ধরল গাজুল। 'পাগল হলে নাকি? ডক্টর স্টিভেনস ঘোরাফেরা করছেন এদিকেই। দেখে ফেললে আমাদের লুকিয়ে থাকার কষ্টটাই মাটি হবে।'

'কিন্তু আমার খিদে পেয়েছে যে!'

'উনি এদিক থেকে চলে গেলেই বেরোব আমরা। খিদে তো আমারও পেয়েছে।' ফিসফিস করে বলল গাজুল। 'খিদের কথা বাদ দাও। যা বলছিলাম। আচ্ছা, এক কাজ তো করা যায়। বোকাগুলোকে চালাক করার জন্যে মগজশক্তি রসায়ন ব্যবহার করতে পারি। কয়েকটা অল্পবয়েসী কিশোর ছেলেকে ধরে নিয়ে যাই চলো। অল্প বয়েসী ছেলেগুলোর প্রচুর শক্তি থাকে শরীরে। খাটতে পারে। মগজটাকে উন্নত করে নেয়া গেলে ভাল গোলাম হবে। দেখলে খুশি হবেন বস।'

'হ্যাঁ, তা হবেন। কিন্তু পছন্দসই ওরকম কয়েকটা বোকা ছেলে পাব কোথায়

আমরা?'

জবাব দেয়ার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল গাজুল। কলিং বেল বাজানোর শব্দে থেমে গেল। এক মুহূর্ত কান পেতে রইল চুপচাপ। তারপর বলল, 'মনে হচ্ছে ডক্টর স্টিভেনসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে কেউ।'

দুই

কলিং বেলের বোতাম টিপে দিয়ে দরজার গোড়ায় বিছানো খড়ের বানানো ম্যাটের ওপর থেকে পিছিয়ে গেল কিশোর পাশা। ঘরের ভেতরে ঘণ্টা বাজার শব্দ শুনতে পেল।

ফিরে তাকাল তার দুই সহকারী মুসা আর রবিনের দিকে, 'কাজটা কি ঠিক হচ্ছে?'

'হচ্ছে।' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা চুলকে জবাব দিল রবিন, 'আঙ্কেল জ্যাক আমাদের সাহায্য করতে না পারলে দুনিয়ার আর কেউ পারবে না।'

দরজার গায়ে লাগানো পিতলের নামফলকটার দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। তাতে লেখা:

ডক্টর জ্যাক স্টিভেনস, ব্রেন এক্সপার্ট
রকি বীচ সাইন্স ল্যাবরেটরি

'কিন্তু সত্যিই যদি আমাদের বোকা ভেবে বসেন তিনি?' মুসার কণ্ঠেও অস্বস্তি।

'এটা আর নতুন কি?' করুণ শোনাল কিশোরের কণ্ঠ। 'সবাই তো আজকাল তা-ই ভাবছে আমাদের। কোনদিন, কখনই আর মনে হচ্ছে স্কুলের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ছেলে হতে পারব না আমরা।'

'ওই যে যা বললাম,' কিশোরের কথার সঙ্গে যোগ করল রবিন, 'আঙ্কেল জ্যাক যদি আমাদের বোকা ভেবে বসেনও, তিনি সাহায্য করতে না পারলে দুনিয়ার আর কেউ করতে পারবে না। তবে, আমি শিওর, তিনি আমাদের ফিরিয়ে দেবেন না। এটুকু ভরসা না থাকলে কি আর আসতাম।'

বাড়ির ভেতরে পদশব্দ কানে এল ওদের। এগিয়ে আসছে।

মাথা চুলকানো বন্ধ করে হাতটা সরিয়ে আনল রবিন।

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে টেনেটুনে কাপড়-চোপড় ঠিক করল কিশোর। অস্বস্তি বোধ করছে। প্যান্টের পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে দিল।

মুসার মুখ দেখে মনে হলো ডক্টরকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দৌড় মারবে। পালানোর জন্যে যেন অস্থির হয়ে উঠেছে সে। সবই এগুলো বোকামির লক্ষণ।

খুলে গেল দরজা। একটা মুহূর্ত ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন আঙ্কেল জ্যাক। তারপর বড় বড় হয়ে গেল চোখ। খুশি খুশি গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে রবিন!

তোরা! কি মনে করে?'

সাদা এলোমেলো চুল, ছড়ানো সাদা দাড়ি, গোলগাল লাল টকটকে হাসিখুশি মুখ, সব মিলিয়ে আঙ্কেল জ্যাককে দেখতে একেবারে সান্তা ক্লজের মত লাগছে। তাঁর চওড়া কাঁধ, বড় বড় হাতের থাবা। মস্ত ভুঁড়ি নেচে ওঠে হাসার সময়।

সব সময় সাদা পোশাক পরেন তিনি। সাদা সোয়েটার, সাদা প্যান্ট, সাদা জুতো। ল্যাবরেটরিতে কাজ করার সময় গায়ে দেন সাদা কোট।

'অ্যাই চেরি,' ভেতরের দিকে তাকিয়ে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে গলা চড়িয়ে হাঁক দিলেন তিনি, 'দেখে যাও কে এসেছে!' গমগমে কণ্ঠস্বর। সরে জায়গা করে দিলেন তিন গোয়েন্দাকে ঢোকার জন্যে।

রান্নাঘর থেকে খাবারের গন্ধ নাকে এসে লাগল। রোস্ট। সম্ভবত মুরগী। চট করে রবিনের দিকে তাকাল মুসা।

'খেতে বসেছিলে?' আঙ্কেলকে জিজ্ঞেস করল রবিন। 'না বসবে?'

'না, শেষ করে ফেলেছি,' আঙ্কেল জ্যাক বললেন। 'তোর আন্টি রান্নাঘরে, এঁটো থালা-বাসন মাজছে। কেন, খিদে পেয়েছে?'

মাথা নাড়ল রবিন, 'না, আমরা খেয়ে এসেছি।'

রান্নাঘরের দরজার দিকে ফিরে আবার হাঁক দিলেন আঙ্কেল জ্যাক, 'চেরি? এই চেরি?' রবিনের দিকে তাকালেন, 'তারপর? হঠাৎ কি মনে করে?'

দ্বিধা করতে লাগল রবিন। 'ইদানীং খুব বোকা হয়ে গেছি আমরা, আঙ্কেল।'

ভুরু কুঁচকালেন আঙ্কেল জ্যাক, 'বোকা হয়ে গেছিস মানে?'

'কি ভাবে বোঝাব ঠিক বুঝতে পারছি না,' কিশোর আর মুসার দিকে তাকাতে লাগল রবিন। শেষে কিশোরকে বলল, 'তুমিই বলো।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর। 'আমরা যে কতখানি বোকা হয়ে গেছি, একটা দিনের ঘটনা বললেই বুঝতে পারবেন...'

তিন

'স্কুল ছুটির পর দেখা কোরো তোমরা আমার সঙ্গে,' ক্লাসে গম্ভীর ভঙ্গিতে আমাদের বললেন ক্লাসটিচার মিস্টার ক্রেগ।

'কিন্তু আমরা তো কিছু করিনি!' অবাক হয়ে প্রতিবাদ জানালাম। জানামতে শাস্তি দেয়ার জন্যেই কেবল স্কুল ছুটির পর কাউকে থাকতে বলেন ক্লাসটিচার।

মিস্টার ক্রেগ শিক্ষক হিসেবে খুব ভাল। ভদ্রলোক। সব ছাত্রছাত্রীরাই তাঁকে পছন্দ করে। আমরাও করি।

দেখা করতে বলেছেন যখন, করতেই হবে।

স্কুল ছুটির ঘণ্টা বাজল। সব ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে গেল। বসে রইলাম কেবল আমি, মুসা আর রবিন।

তিনটে পরীক্ষার খাতা বের করলেন মিস্টার ক্রেগ। মুখ তুলে তাকালেন 'তোমাদের খাতা।'

মাথার চুলে হাত বোলালেন তিনি। চোখের পাতা সরু করে তাকালেন খাতাগুলোর দিকে। তারপর ঘোষণা করলেন, 'এই সেমিস্টারের অংক পরীক্ষায়ও সাংঘাতিক খারাপ করেছ তোমরা। পুরোপুরি ফেল।'

ঢোক গিললাম। রবিন গুঙিয়ে উঠল। আর মুসা চোখ নামিয়ে তাকিয়ে রইল নিজের জুতোর দিকে।

'তিনজনেই এতটা খারাপ করবে কল্পনাই করতে পারিনি,' নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন তিনি। 'এতটা খারাপ তো তোমরা ছিলে না কখনও। কি হয়েছে তোমাদের, বলো তো?'

নির্বাক হয়ে রইল মুসা আর রবিন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'জানি না, স্যার। কিছুই ঢোকে না মাথায়। কিছু বুঝতেও পারি না। অনেক কিছুই মনে থাকে না। অতীতের অনেক কথা মনে করতে পারি না। মনে হয় বিস্মরণ ঘটেছে আমাদের।'

'কিন্তু বিস্মরণের সঙ্গে বোকামির সম্পর্ক কি?'

'জানি না, স্যার,' বিড়বিড় করে বললাম।

বোকার মত মাথা চুলকে যাচ্ছে রবিন।

মুসা কোন কথা বলছে না।

খাতাগুলো আমাদের সামনে নাড়তে নাড়তে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার ক্রেগ, 'অন্য সব কথা থাক। অংকে তোমরা কেন খারাপ করেছ, সেটা বরং পর্যালোচনা করে দেখি।' খাতাগুলো ডেস্কে নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'তোমাদেরকে যে রিভিউ শীটগুলো দিয়েছিলাম, পড়েছ ওগুলো?'

'পড়েছি, স্যার,' একসঙ্গে জবাব দিলাম তিনজনে।

'বহুত মাথা ঘামিয়েছি এ নিয়ে,' রবিন বলল।

'কিন্তু এত কঠিন,' যোগ করল মুসা, 'কিছুই বুঝতে পারিনি।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন মিস্টার ক্রেগ। 'তোমাদের যে কিছু হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই আমার। সাহায্য দরকার? প্রয়োজন মনে করলে আমি তোমাদের সাহায্য করতে পারি। কি করতে পারি, বলো?'

'কি জানি, তা-ও তো বুঝতে পারছি না, স্যার,' মাথা চুলকানো বেড়ে গেল রবিনের।

'আসলে, অংক আমাদের মাথায় ঢোকে না, স্যার,' আমি জবাব দিলাম। 'অংক একেবারেই বুঝি না।'

'তুমি অংক বোঝো না এ কথা বিশ্বাস করতে বলো আমাকে?' ভুরু কুঁচকে বললেন মিস্টার ক্রেগ। 'আসলে পড়ালেখা বাদ দিয়ে নিশ্চয় গোয়েন্দাগিরি নিয়ে বেশি বেশি মেতে উঠেছ। পড়াশোনায় পুরো ফাঁকি দিচ্ছ।...যাকগে, যা হবার হয়েছে। এবারকার মত ছেড়ে দিলাম। এখন থেকে লেখাপড়ায় ভালমত মনোযোগ দেবে। কি, বুঝেছ?'

'বুঝেছি, স্যার,' মিস্টার ক্রেগকে এ ভাবে রেগে যেতে দেখে অবাক হলাম খুব।

কয়েক মিনিট পর স্কুল থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দিলাম তিনজনে।

গরমকাল। অথচ প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া বইছে। রাস্তার মোড় পেরিয়ে এসে হাসাহাসি হই-চই কানে এল। টেরি আর তার দুই দোস্ত টাকি ও কডি খেলছে। আমাদের দেখে ফিরে তাকিয়ে টিটকারি দিতে শুরু করল ওরা। ইদানীং ওরাও আমাদের চেয়ে ভাল রেজাল্ট করে।

'এতটা বোকা কি করে হয়ে গেলাম আমরা?' বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে আপনমনেই বিড়বিড় করল রবিন।

ফিরে তাকাল মুসা, 'মাথার মধ্যে কিচ্ছু নেই আমাদের। মাঝে মাঝে এতই মন খারাপ হয়ে যায়, ইচ্ছে করে যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাই।'

কিশোর থামলে রবিন বলল, 'এবার আমার কথা শোনো...'

কিশোর যেদিনকার কথা বলল, সেদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে হলঘরে ঢুকতেই দেখা হয়ে গেল রিনিতার সঙ্গে।

রিনিতা আমার ছোট। আমার খালাত বোন। আমাদের বাড়িতে থাকতে এসেছে। ওর মা মারা গেছেন ক্যান্সারে। বাবা একসঙ্গে নিজের কাজকর্ম আর মেয়ের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেছেন। শেষে মা'কে অনুরোধ করেছেন মেয়েটাকে কিছুদিন দেখাশোনা করার জন্যে। একটু গুছিয়ে নিয়েই আবার তিনি মেয়েকে নিয়ে যাবেন।

রিনিতাকে নিয়ে এসেছে মা। স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে।

কার্পেটে পা ছড়িয়ে বসে খেলছে রিনিতা। হাতের কাছে, আশেপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে নানা রঙের অসংখ্য প্লাস্টিকের টুকরো। আমার দিকে তাকিয়ে মাতব্বরি চালে ভুরু নাচাল। 'এত দেরি কেন?'

রিনিতা আমাকে সব সময় খোঁচায়। নানা ভাবে যন্ত্রণা দেয়। একটা কথা বলতে পারি না। বললেই গিয়ে দশখান করে বানিয়ে বানিয়ে মা'র কাছে বিচার দেয়। মা'ও রিনিতার পক্ষ নিয়ে আমাকেই বকে। রাগে গা জ্বলে। মনে মনে ভাবি, "এই বিচ্ছু মেয়েটাকে বাড়িতে নিয়ে আসাটাই হয়ে গেছে এক মস্ত ভুল।'

যাই হোক, রিনিতার প্রশ্ন শুনে আগে হলে হয়তো রেগে উঠতাম। জবাব দিতাম, 'সেটা জেনে তোমার কি লাভ? নিজের চরকায় তেল দাও।' কিন্তু ইদানীং বোকা হয়ে যাওয়ার পর কেমন মানসিক ভাবেই দুর্বল হয়ে পড়েছি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিনমিন করে জবাব দিলাম, 'স্কুলের পরেও থাকতে হয়েছে।'

'কেন? ফেলটেল করেছ নাকি? ঠাসানি দিয়েছে টিচার?'

প্রশ্নটা এড়ানোর জন্যে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি করছ?'

'হাঁদা নাকি?' মুখ ঝামটা দিল রিনিতা। 'দেখছ না খেলছি? প্লাস্টিকের টুকরোগুলো দিয়ে প্রথমে একটা ঘর বানাব। বাস স্টেশন। তারপর একটা বাস।

স্টেশনের সামনে রাখব। কিন্তু দেখো না, ঠিকমত জোড়াই লাগাতে পারছি না। মায়ার জন্যে অপেক্ষা করছি। ও এলে একটা ব্যবস্থা হবেই।'

'দেখি, আমাকে দাও তো।'

'দূর,' আমার হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিল রিনিতা, 'তুমি কি লাগাবে? তুমি তো একটা হাঁদা। কালকে মনে নেই, সাধারণ একটা বাক্স বানাতে দিলাম, তাই পারলে না। স্কুলে এত দেরি করলে কেন? পড়া পারোনি বলে টিচার আটকে নাকি?'

ঘাবড়ে গেলাম। কোন প্রসঙ্গই সহজে ভোলে না রিনিতা। ওর এ সব কথা মা'র কানে গেলে জিজ্ঞেস করতে আসবে। তখন পড়ব আরও বিপদে।

'থাক থাক, সাহায্য করতে চেয়েছিলাম, ভাল লাগল না,' রিনিতাকে বলে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম সেখান থেকে।

চার

রবিন থামলে মুসার দিকে তাকালেন আঙ্কেল জ্যাক। 'এবার তোমার কোনও ঘটনার কথা বলো।'

হাত ওল্টাল মুসা। 'কি আর বলব? আমারগুলোও ওদের চেয়ে ভাল কিছু না।'

'তারমানে তুমি কিছু বলতে চাও না?'

মাথা নাড়ল মুসা। শুধু একটা কথাই বলি, 'এ ভাবে মাঝে মাঝেই বিপদে পড়তে হয়, অপদস্থ হতে হয় আমাদের তিনজনকে।'

'হুঁ,' গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন আঙ্কেল জ্যাক। চেয়ারে বসে সামনের দিকে ঝুঁকলেন। এক এক করে তাকালেন রবিন, কিশোর ও মুসার দিকে। 'তাহলে তোমাদের ধারণা তোমরা বোকা হয়ে গেছ?'

'কোন সন্দেহ নেই আর তাতে,' এক আঙুল দিয়ে গাল চুলকাল কিশোর।

বিস্কুট আর দুধ এনে সামনে রেখে গেছেন চেরি আন্টি। কিন্তু ছুঁয়েও দেখল না কিশোর কিংবা রবিন। এমনকি মুসাও খাবারের দিকে একবার তাকিয়ে সেই যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, আর তাকাচ্ছে না। বোকা হয়ে যাওয়াতে খাবারের লোভও যেন চলে গেছে তার। চেয়ারে পিঠ খাড়া করে শক্ত হয়ে বসে আছে তিনজনে। কোলের ওপর হাত রেখে।

'আসলে হয়তো বোকা নই আমরা,' কিশোর বলল। 'কিন্তু চালাকও নই। মাথায় ঘিলু বলতে কিচ্ছু নেই আমাদের।'

'বোকা নই মানেটা কি?' রবিন বলল। 'বোকাই আমরা।'

'একেকটা রামছাগল,' মুসা বলল। 'গাধা। চেহারাটা গাধার মত হলে সারাক্ষণ ব্যা-ব্যাই করতাম।'

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলেন আঙ্কেল জ্যাক। চোখের পাতা সরু করে

চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকালেন ওদের দিকে। 'আমাকে কি করতে বলো?'

'ইয়ে···' বলতে গিয়ে চুপ হয়ে গেল কিশোর। দ্বিধা করতে লাগল।

শেষে রবিন বলল, 'তুমি একজন বুদ্ধিমান লোক, তাই না আঙ্কেল? তুমি একজন বিজ্ঞানী।'

মাথা ঝাঁকালেন আঙ্কেল জ্যাক।

'আর বিজ্ঞানীদের সারাক্ষণই মাথা খাটানোর কাজ করতে হয়, ঠিক?'

আবার মাথা ঝাঁকালেন আঙ্কেল জ্যাক।

'এবং তুমি একজন ব্রেন স্পেশালিস্ট, তাই তো?' আবার প্রশ্ন করল রবিন।

তৃতীয়বার মাথা ঝাঁকালেন আঙ্কেল জ্যাক।

'সেজন্যেই এসেছি আপনার কাছে,' এতক্ষণে যেন কথা খুঁজে পেল কিশোর। 'কারণ আপনিই আমাদের বুদ্ধিমান বানানোর একটা উপায় বের করতে পারবেন।'

'আঙ্কেল,' অনুরোধের সুরে বলল রবিন, 'সত্যিই কি আমাদের জন্যে তুমি কিছু করতে পারো না? বুদ্ধি খানিকটা বাড়িয়ে দিতে পারো না আমাদের?'

চিবুক ডললেন আঙ্কেল জ্যাক। সোজা হলেন চেয়ারে।

'হ্যাঁ,' অবশেষে জবাব দিলেন তিনি, 'পারি। এমন একটা ওষুধ আমি দিতে পারি, যেটাতে মনে হচ্ছে কাজ হবে।'

'কি ওষুধ?' একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল তিন গোয়েন্দা।

পাঁচ

আবার সামনে ঝুঁকলেন আঙ্কেল জ্যাক। জবাব দিতে গিয়ে হঠাৎ ঘুরে তাকালেন রান্নাঘরের দরজার দিকে।

'কি হলো, আঙ্কেল?' জানতে চাইল রবিন।

আবার ওদের দিকে ঘুরলেন তিনি। 'শুনলে না? মনে হয় চেরি।' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন তিনি। 'অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন আমাদের ওপর নজর রেখেছে কেউ।'

দরজার দিকে তাকাল কিশোর। রবিন আর মুসার চোখও ঘুরে গেল সেদিকে। অস্বাভাবিক কোন কিছু চোখে পড়ল না।

'কই?' কিশোর বলল। 'দেখছি না তো কিছু।'

কাঁধ ঝাঁকালেন আঙ্কেল জ্যাক। 'টপ সিক্রেট কোন কাজ করার সময় সব বিজ্ঞানীরই বোধহয় এ রকম অনুভূতি হয়।' সাদা সোয়েটশার্টের আস্তিন টেনে নামালেন তিনি। গভীর ভাবে ভাবছেন মনে হচ্ছে কোন বিষয় নিয়ে।

'আঙ্কেল,' অস্থির হয়ে উঠল রবিন, 'তোমার কি মনে হয় আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে?'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে রইলেন আঙ্কেল জ্যাক। তারপর জবাব দিলেন,

'অ্যাঁ!...হ্যাঁ, পারব।'

উত্তেজিত ভঙ্গিতে চেয়ারের হাতলে চাপড় মারল মুসা। 'সত্যি বলছেন? সত্যি পারবেন?'

মাথা ঝাঁকালেন আঙ্কেল জ্যাক। 'হ্যাঁ। এ মুহূর্তে আমি অবশ্য এ ধরনেরই একটা জরুরী গবেষণায় ব্যস্ত। জিনিসটা তোমাদের ওপর প্রয়োগ করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু...'

'কিন্তু কি?' আগ্রহে সামনে ঝুঁকে এল মুসা।

আবার রান্নাঘরের দরজার দিকে তাকালেন আঙ্কেল জ্যাক। 'জিনিসটা ভীষণ বিপজ্জনক।'

ঘন ঘন চোখের পাতা পিটপিট করল কিশোর।

অস্ফুট শব্দ করে উঠল রবিন।

ঢোক গিলল মুসা। 'তাহলে?'

'বিপজ্জনক হবে কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না,' আবার বললেন আঙ্কেল জ্যাক। 'তবে হতেও পারে।'

'হোক বিপজ্জনক,' কিশোর বলল। 'কাজ হবে তো?'

মাথা দোলালেন আঙ্কেল জ্যাক, 'হ্যাঁ, তা হবে। কাজ হতে বাধ্য। আমি টেস্ট করেছি। টেস্ট করা না থাকলে তোমাদের ওপর প্রয়োগ করতে যেতাম না মরে গেলেও।'

'তাহলে...তাহলে প্রয়োগ করে দেখো না আমাদের ওপর,' অধৈর্য হয়ে উঠল রবিন।

'হ্যাঁ, করুন না, অসুবিধে নেই,' কিশোর বলল। মুসাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি বলো?'

'আমিও রাজি,' মুসা বলল।

ভ্রূকুটি করলেন আঙ্কেল জ্যাক। আবার একবার হারিয়ে গেলেন গভীর চিন্তায়।

তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে আচমকা ওদেরকে চমকে দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'বেশ। তাই করব। তোমাদের ওপর প্রয়োগ করব ওই ওষুধ। দেখা যাক, আমার গবেষণা কতখানি সফল হয়।'

ছয়

ওদেরকে লিভিং রুমে বসিয়ে রেখে উঠে গেলেন আঙ্কেল জ্যাক। নিজের মনে গুনগুন করতে করতে ঢুকে গেলেন গবেষণাগারের মধ্যে। কয়েক মিনিট পর গুনগুন করতে করতেই গিয়ে ঢুকলেন রান্নাঘরে।

রান্নাঘরের টেবিলে বসে মুদী দোকানের ফর্দ করছেন চেরি আন্টি। মুখ তুলে তাকালেন। সুন্দরী, মাথায় সোনালি চুল, মোলায়েম বাদামী চোখ, মুখে আন্তরিক

হাসি। 'কি ব্যাপার, জ্যাক? বাচ্চাগুলোর সঙ্গে তোমার টপ সিক্রেট ব্যক্তিগত আলোচনা শেষ হলো? ওদের সঙ্গে কথা বলতে যেতে পারি এখন?'

আন্টিকে বসে থাকতে ইশারা করলেন আঙ্কেল জ্যাক। আনমনে বিড়বিড় করলেন, 'বেচারারা!'

আলমারি খুলে শিশি-বোতল আর বয়াম ঘাঁটতে শুরু করলেন তিনি।

পাশে এসে দাঁড়ালেন চেরি আন্টি। 'কি হয়েছে? ওদেরকে এত বিমর্ষ দেখলাম কেন? কি বলতে এসেছে তোমাকে?'

যা খুঁজছিলেন পেয়ে গিয়ে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠলেন আঙ্কেল জ্যাক। আঙুরের রস ভর্তি একটা ছোট বোতল বের করলেন।

স্ত্রীর দিকে ঘুরলেন তিনি। 'রবিন আর তার দুই বন্ধুর কি করে যেন মগজে গেঁথে গেছে ওরা বোকা হয়ে গেছে।'

আঙুরের রসের বোতল থেকে চোখ সরিয়ে স্বামীর দিকে তাকালেন চেরি আন্টি। 'বুঝলাম না। বোকা হয়ে গেছে মানে?'

'বোকা হয়ে গেছে মানে বোকা হয়ে গেছে।' বোতলটার দিকে তাকিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকালেন আঙ্কেল জ্যাক। 'বড় মুষড়ে পড়েছে বেচারারা। ওরা আমার কাছে এসেছে এমন কোন ওষুধ আছে কিনা জানতে যেটা ওদের বুদ্ধিমান বানিয়ে দিতে পারে।'

হাঁ হয়ে ঝুলে পড়ল চেরি আন্টির নিচের চোয়াল। 'ওদেরকে কী বলেছ তুমি? বলেছ তো ওরা ঠিকই আছে, অকারণ দুশ্চিন্তা করে করে...'

ঠোঁটে আঙুল রেখে আন্টিকে চুপ থাকতে ইশারা করলেন আঙ্কেল জ্যাক। ফিসফিস করে বললেন, 'শুকনো কথায় আত্মবিশ্বাস তৈরি হবে না ওদের। কোন কারণে আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে—এটাই হলো ওদের সমস্যা। নিজেদের ওপরই আর কোন আস্থা নেই ওদের।'

'কি করবে তাহলে?' জিজ্ঞেস করলেন চেরি আন্টি।

'এই যে, ওষুধ দিচ্ছি,' জবাব দিলেন আঙ্কেল জ্যাক। 'ল্যাবরেটরি থেকে কম্পিউটারে একটা লেবেল প্রিন্ট করে এনেছি।'

বোতলটা কাউন্টারে রাখলেন আঙ্কেল জ্যাক। লেবেলটা বের করে দেখালেন আন্টিকে। তাতে লেখা: **বুদ্ধি বাড়ানোর টনিক।**

লেখাটার দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করলেন চেরি আন্টি, 'এ রকম কোন ওষুধের কথা তো জন্মেও শুনিনি!'

দরাজ হাসি ছড়িয়ে পড়ল আঙ্কেলের মুখে। 'আমিও শুনিনি। তবে ওদের আমি বলব এটা আমার নিজের আবিষ্কৃত ওষুধ, বুদ্ধি বাড়ায়। ওদের বিশ্বাস জন্মানোটাই হলো আসল কথা। ওষুধে কাজ করছে এটা ভাবতে আরম্ভ করলেই আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে।'

জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন চেরি আন্টি। 'দেখো কাজ হয় কিনা।'

তাড়াহুড়া করে লিভিং রুমের দিকে চলে গেলেন তিনি। ছেলেদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে।

বোতলের দিকে মনোযোগ দিলেন তিনি। সুন্দর করে লেবেলটা লাগিয়ে দিলেন বোতলের গায়ে। তারপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভালমত দেখলেন 'আঙুরের রস' লেখা আসল লেবেলটা কোনখান দিয়ে দেখা যায় কিনা।

'হয়েছে,' সন্তুষ্ট হয়ে নিজেই ঘোষণা দিয়ে জানালেন নিজেকে। 'চমৎকার। পুরানো লেবেলটা দেখা যায় না। এটাকে মগজ উন্নত করার কিংবা বুদ্ধি বাড়ানোর ওষুধ ভাবতে আর আপত্তি কোথায়?'

ভাগ্যিস, বুদ্ধিটা এসেছিল মাথায়। আপনমনে হাসলেন আঙ্কেল জ্যাক। বোতলটা হাতে নিয়ে রওনা দিলেন লিভিং রুমের দিকে।

এই সময় টেলিফোন বাজল। ফোনটা রয়েছে ল্যাবরেটরিতে। হলের শেষ মাথার ঘরটা ল্যাবরেটরি।

কাউন্টারে বোতলটা রেখে ছুটলেন ফোন ধরার জন্যে।

এই সুযোগে লুকানোর জায়গা থেকে বেরিয়ে এল মাজুল আর গাজুল।

ল্যাবরেটরির দরজার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল গাজুল, 'এটাই আমাদের সুযোগ।'

'কি করবে?' লিভিং রুমের দরজার দিকে তাকাতে তাকাতে জিজ্ঞেস করল মাজুল।

'দেখোই না কি করি।'

বোতলটা তুলে নিয়ে মুখটা খুলে ফেলল গাজুল।

'কি করছ?' জানার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে মাজুল।

'আহ, চুপ থাকো না! ওরা শুনতে পেলে দৌড়ে আসবে দেখার জন্যে। আমার প্ল্যানটাই তখন বাতিল। গোলাম বানানোর জন্যে আর ধরে নিয়ে যাওয়া যাবে না ছেলেগুলোকে।'

আর কিছু না বলে চুপচাপ তাকিয়ে রইল মাজুল।

বোতলটাকে কাত করে সমস্ত রস সিংকে ফেলে দিল গাজুল। কোমরে ঝোলানো একটা ব্যাগ থেকে আরেকটা বোতল বের করল। সেটা থেকে পানির মত রঙহীন তরল পদার্থ ঢালল প্রথম বোতলটায়। ছোট ছোট নানা রঙের শিশিও আছে ব্যাগটাতে। আঙুরের রসটা যে রঙের ছিল, সে-রকম রঙ মিশিয়ে দিল বোতলের তরল পদার্থে। দেখতে অবিকল আঙ্কেল জ্যাকের রেখে যাওয়া আঙুরের রসের মতই রঙ হয়ে গেল জিনিসটার।

সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল গাজুল। 'কিছু বুঝলে? আমাদের ল্যাবরেটরিতে তৈরি করা মগজ উন্নত করার সত্যিকারের ওষুধ মিশিয়ে দিলাম। মগজশক্তি রসায়ন মানুষের ব্রেনের ওপর কতখানি কাজ করবে জানি না। তবে আশা করি বোকা ছেলেগুলোর এবার খানিকটা হলেও বুদ্ধি বাড়বে। আর তা হলেই হয়ে গেল আমাদের কাজ।'

লেবেল লাগানো আঙুরের রসের বোতলটার মুখ লাগিয়ে আবার আগের জায়গায় রেখে দিল গাজুল।

ল্যাবরেটরির দিক থেকে পায়ের শব্দ শোনা গেল।

'জলদি!' তাড়া দিল গাজুল। 'আলমারির পেছনে!'

বোতলটার দিকে তাকিয়ে আছে মাজুল। 'কোন মানুষকে কখনও এ ফরমুলা খাওয়ানো হয়নি। কি ঘটবে কে জানে! যদি রিঅ্যাকশন হয়? মগজের ওষুধ, বলা যায় না, পাগলও তো হয়ে যেতে পারে। মরে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

সঙ্গীর কাঁধে জোরে এক ঠেলা মেরে আলমারির দিকে ঘুরিয়ে দিল গাজুল। 'মারা গেলে আর কি করব। গবেষণা করতে গেলে এ রকম দু'চারজন মারা যেতেই পারে। দেখা যাক কি হয়···চলো চলো···'

সাত

রান্নাঘরে ফিরে এলেন আঙ্কেল জ্যাক।

বোতলটা তুলে নিয়ে লিভিং রুমের দিকে এগোলেন তিনি। কানে আসছে চেরি আন্টি আর ছেলেদের কথাবার্তা, হাসাহাসির শব্দ।

দরজার কাছে এসে এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন তিনি। তারপর মুচকি হেসে ঢুকে পড়লেন ঘরের মধ্যে। বোতলটা তুলে দেখালেন ছেলেদের। 'এই যে, তোমাদের ওষুধ।'

বোতলটা প্রথমে কিশোরের হাতে দিলেন তিনি।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল কিশোর। চোখের পাতা সরু হয়ে এল। সন্দেহ ফুটল তাতে। 'বুদ্ধি বাড়ানোর ওষুধ?'

মুখভঙ্গি নির্বিকার করে রেখে মাথা ঝাঁকালেন আঙ্কেল জ্যাক। 'হ্যাঁ, আমার নিজের ফরমুলা। বহু বছর ধরে এর ওপর গবেষণা করেছি আমি।'

চেরি আন্টির পাশে কাউচে বসে পড়লেন তিনি। 'জিনিসটা কি ভাবে কাজ করে ব্যাখ্যা করে বোঝানো খুব কঠিন। বুদ্ধিমান মানুষদেরই সহজে মাথায় ঢুকতে চাইবে না, আর তোমরা তো বোকাই হয়ে গেছ। তবু বলি, এটা হলো নিউরন আর প্রোটনের ব্যাপার-স্যাপার। তার যুক্ত হয়েছে মগজে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহের নিয়ম-কানুন···'

অত কঠিন কঠিন কথা শুনতে গিয়ে মাথা ঘুরে যাবার জোগাড় হলো মুসার। বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কা-কা-ক্কাজ হবে তো?'

ভয়ে ভয়ে বলল রবিন, 'মগজ বদলে দেবে?' কিশোরের হাতের বোতলটার দিকে তাকাল সে।

'না, তা বদলাবে না,' আশ্বস্ত করলেন আঙ্কেল জ্যাক। আড়চোখে পরস্পরের দিকে তাকালেন তিনি আর চেরি আন্টি। আবার ছেলেদের দিকে ফিরলেন আঙ্কেল জ্যাক। 'সোজা করে বলতে গেলে তোমাদের মগজের বুদ্ধি চলাচলের রাস্তার মধ্যে যে প্রতিবন্ধকতাগুলো সৃষ্টি হয়েছে, যার জন্যে বোকা হয়ে গেছ তোমরা, সেটা দূর

করতে সাহায্য করবে এই ওষুধ। তোমাদের মগজের মহাসড়কটা খুলে দেয়ার ব্যবস্থা করেছি আমি। মগজে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহকে আরও খোলাখুলি ভাবে প্রবাহিত করতেও সাহায্য করবে এই ওষুধ।'

এত বড় জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার পরেও সন্দেহ যেতে চাইল না কিশোরের। বোতলটার দিকে তাকাল আবার। 'তো কি করব আমরা এখন? কতটা করে ওষুধ খেতে হবে?'

'পুরোটাই,' আঙ্কেল জ্যাক বললেন। 'তিন দাগ ওষুধ আছে এখানে। সমান সমান তিন ভাগ করে খেয়ে ফেলবে আজ রাতে।'

'তারপর?' রবিনের প্রশ্ন।

'তারপর, স্রেফ ভুলে যাবে এটার কথা। মনে করারও আর প্রয়োজন নেই। জোর করে চালাক হওয়ার চেষ্টা কোরো না। সব কিছু ভুলে গিয়ে পড়ালেখায় মন দেবে। কোন কাজকেই অবহেলা করবে না। যত বেশি পরিশ্রম করবে, যত বেশি মনোযোগী হবে, তত দ্রুত বুদ্ধি খুলতে থাকবে তোমাদের।'

তাঁর গোল লাল টকটকে মুখে কোমল হাসি ছড়িয়ে পড়ল। 'তারপর দেখো কি ঘটে। আমার বিশ্বাস, তোমাদের মনের কষ্ট দূর হবে।'

'সত্যিই বুদ্ধিমান হব তো?' সন্দেহ যাচ্ছে না কিশোরের।

'হবে হবে...'

বাইরে গাড়ির হর্নের শব্দ হলো। দু'বার খাটো, একবার লম্বা।

'ওই যে, বোধহয় হ্যারি এল। আমার সহযোগী বিজ্ঞানী।' উঠে দাঁড়ালেন আঙ্কেল জ্যাক। 'জরুরী মীটিং আছে তার সঙ্গে।'

'ঠিক আছে, আমরা তাহলে যাই,' বোতলটা হাতে নিয়ে কিশোরও উঠে দাঁড়াল। 'রবিন, যাবে না?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, যাব তো বটেই।'

'কি হয় জানিও,' আঙ্কেল জ্যাক বললেন। 'আরেকটা কথা, এটা আমার অতি গোপন একটা আবিষ্কার। কাউকে বোলো না।'

বলবে না কথা দিয়ে, আঙ্কেল আর আন্টি দু'জনকেই ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল ওরা।

বোতলটা কোটের পকেটে ভরে রাখল কিশোর।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবে?'

'চলো, আগে আমাদের বাড়িতেই যাই। দেরি না করে ওষুধটা খেয়ে ফেলি। তারপর তোমাদের যেখানে ইচ্ছে যেও।'

কিশোরদের বাড়িতে ঢুকে সোজা মুসা আর রবিনকে নিজের ঘরে নিয়ে এল কিশোর। ওদেরকে ওখানে বসিয়ে রেখে নিচতলায় গিয়ে উঁকি মেরে দেখে এল মেরিচাচী কোথায়।

তিনি ওখানে নেই। তারমানে তাঁর অফিসে। কাজে ব্যস্ত। ইয়ার্ডের কর্মচারী বোরিস আর রোভার গেছে রাশেদ পাশার সঙ্গে পুরানো মাল কিনতে।

দ্রুত তিনটে গ্লাস তুলে নিয়ে আবার ওপরতলায় উঠে এল সে। টেবিলে রাখল

ওগুলো। সমান তিন ভাগে ভাগ করল ওষুধটাকে।

'সত্যি সত্যি কাজ হবে তো?' হালকা লালচে রঙের তরল পদার্থটার দিকে তাকিয়ে থেকে ফিসফিস করে বলল মুসা। 'আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না।'

নিজের গ্লাসটা তুলে নিল রবিন। 'আঙ্কেল জ্যাকের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারো। অসম্ভব বুদ্ধিমান। আমাদের সঙ্গে মিথ্যে বলবেন না।'

হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। 'কাণ্ডটা কি হবে ভাবো তো? বুদ্ধিমান হয়ে যাব আমরা। আর আমাদেরকে বোকা বলার সাহস পাবে না কেউ। কি সাংঘাতিক ব্যাপারই না হবে!'

'হ্যাঁ, সাংঘাতিক,' রবিন একমত হলো তার সঙ্গে।

একসঙ্গে গ্লাস তুলল ওরা। গ্লাসে গ্লাসে টোকা লাগিয়ে টোস্ট করল বড়দের মত করে।

উজ্জ্বল আলোয় ঝিক করে উঠল রঙিন তরল।

'খেতে কেমন লাগবে আল্লাহ্ই জানে,' দ্বিধা করছে কিশোর।

'যেমনই লাগে খেয়ে ফেলা যাক,' রবিন বলল। 'যত দেরি করব, ততই ভয় বাড়বে।'

একসঙ্গে ঠোঁট লাগিয়ে গ্লাসে চুমুক দিল তিনজনে। ইঞ্চিখানেক ওষুধ থাকতেই গ্লাসটা নামিয়ে রাখল মুসা। 'বিচ্ছিরি স্বাদ! আর এত ঘন!'

'খেয়ে ফেলো, মুসা, খেয়ে ফেলো,' কিশোর বলল। 'কাজে লেগেও যেতে পারে।'

'বোকা থাকা চলবে না আমাদের,' যোগ করল রবিন।

আবার গ্লাস ঠোঁটে ঠেকাল ওরা। কোনমতে মুখে ঢেলে গিলে ফেলল। গ্লাসগুলো নামিয়ে রাখল।

ঠোঁটে লেগে থাকা ওষুধ চেটে মুসা বলল, 'জঘন্য! এত ভয়াবহ স্বাদের জিনিস জীবনে মুখে দিইনি।'

'হুঁ। মিকশ্চারও অত খারাপ না,' কিশোর বলল। 'দুনিয়ার সবচেয়ে বাজে স্বাদের ওষুধ।' কয়েকবার ঢোক গিলে স্বাদটা জিভ থেকে নামিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল সে। ওয়াক ওয়াক করল। 'মনে হচ্ছে বেরিয়ে চলে আসবে।' মুসার দিকে তাকাল। 'চিউয়িং গাম আছে নাকি?'

পকেটে হাত দিল মুসা।

'কি, চালাক চালাক লাগছে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'উঁম!...মনে তো হচ্ছে,' জবাব দিল কিশোর।

'রাইনসরাস বানান করো তো।'

'উঁ?'

'রাইনসরাস। করো। বানান করো।'

দ্বিধা করতে লাগল কিশোর। ভাবছে। তারপর বলল, 'আর-আই-এন-ও...'

'থামো থামো,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল রবিন। 'কাজ করছে না ওষুধ।'

'এত দ্রুত নিশ্চয় কাজ করে না এই ওষুধ,' মুসা বলল। 'সময় দিতে হবে। ওই যে আঙ্কেল বললেন, চিন্তার রাস্তার প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে হবে···নিশ্চয় অতিরিক্ত ময়লা পড়ে গেছে। সাফ হতে সময় লাগবে।'

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। 'তা লাগুক। বুধবারের মধ্যে হয়ে গেলেই বাঁচি।'

'কেন? বুধবার কেন?'

'ভুলে গেছ, বুধবারে অংক পরীক্ষা?'

হাই তুলতে শুরু করল কিশোর। 'হঠাৎ করেই ঘুম পাচ্ছে আমার।'

'আমারও,' রবিন বলল।

'আমি তো চোখই টেনে খুলে রাখতে পারছি না,' টেবিলের ওপরই মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তে চাইল মুসা। 'বাড়ি যাওয়া এখন আমার পক্ষে দুঃসাধ্য!'

'থাক, যাওয়ার দরকার নেই,' কিশোর বলল। 'রাতে আমাদের এখানেই থেকে যাও। বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দাও রাতে ফিরবে না।'

ঘুমজড়িত স্বরে মুসা জবাব দিল, 'আমার ফোন করার ক্ষমতাও নেই।'

আট

পা টিপে টিপে ওপরতলায় উঠল মাজুল আর গাজুল।

না দেখে কিসে যেন পা বেধে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল মাজুল।

চাপা গলায় ধমকে উঠল গাজুল, 'আহ্, আস্তে! দেখে হাঁটো! সারা বাড়ির লোক সব জাগিয়ে দেবে দেখছি।'

মাজুল বলল, 'এখানে কেন এলে, এখনও বলোনি কিন্তু।'

'মগজশক্তি রসায়ন তোমারও খাওয়া উচিত,' বিরক্তকণ্ঠে বলল গাজুল। 'আরে গাধা, এখানে এসেছি শিওর হতে, ওষুধটা খেল কিনা ছেলেগুলো, ওষুধে কাজ হলো কিনা দেখতে।'

ভারী পায়ে অন্ধকার হল ধরে হেঁটে চলল দু'জনে। কিশোরের শোবার ঘরের সামনে এসে থামল। উঁকি দিল ভেতরে।

'ওই যে একটা ছেলে,' ফিসফিস করে বলল গাজুল।

'বাকি দুটো কোথায়? এ বাড়িতেই তো ঢুকতে দেখলাম। আর বেরোয়নি।'

'আছে অন্য কোন ঘরে। গেস্টরুমে।'

নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল দু'জনে। টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। তিনটে গ্লাস পড়ে আছে। সব ক'টাতেই লালচে ওষুধের তলানি।

একটা গ্লাস তুলে নিয়ে শুঁকে দেখল গাজুল। হাসি ফুটল মুখে। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, খেয়েছে। তিনটে খালি গ্লাস। তিনজনেই খেয়েছে।'

ফিরে তাকিয়ে দেখল বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মাজুল।

কিশোরের মুখের কাছে ঝুঁকে দেখতে লাগল।

দেখতে দেখতে কুঁচকে গেল তার ভুরু।

হাত নেড়ে ডাকল, 'গাজুল, এদিকে এসো তো!'

'কি হলো?'

'দেখো তো মরেটরে গেল নাকি!'

শঙ্কিত হয়ে উঠল গাজুল। তাড়াতাড়ি বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল। কিশোরের নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখল। ফিরে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বলল, 'উহ্, পিলে চমকে দিয়েছিলে! তোমাকে গাধা কি আর সাধে বলি। দিব্যি তো নিঃশ্বাস পড়ছে।'

লজ্জিত ভঙ্গিতে মাথা চুলকাল মাজুল। 'নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখার কথা মনেই হয়নি।'

'তা তো হবেই না। হয় তোমাকেও ওষুধ খাওয়ানো দরকার, নয়তো বাড়ি ফিরে ওঅর্কশপে গিয়ে মগজটা খুলে দেখা দরকার কোথায় কি গোলমাল হলো। তোমার এ সব বোকামির কথা মনিব শুনলে হয়তো তোমাকে বিকল বানিয়েই ফেলে রাখবে। কিংবা হাওয়া করে দেবে।'

ভয় দেখা দিল মাজুলের চোখে। 'না-না-না, দোহাই তোমার, বসকে বোলো না, প্লীজ! তুমি না আমার বন্ধু।'

'হুঁ। এখন থেকে মাথাটা খেলানোর চেষ্টা করবে।'

'করব। করব।'

'চলো, বেরিয়ে যাই,' গাজুল বলল। 'দেখা তো হলো।'

'বাকি ছেলে দুটোকে দেখবে না?'

'না, দরকার নেই। তিনটে গ্লাসে ওষুধ, তারমানে তিনজনেই খেয়েছে। আর এই ছেলেটা যখন ভাল আছে, বাকি তিনটেও থাকবে, সন্দেহ নেই তাতে।'

'কিশোর! এই কিশোর! কিশোর!'

ডাক শুনে চোখ মেলল কিশোর। দেখল জানালার পর্দা সরিয়ে দিচ্ছেন মেরিচাচী। রোদ এসে পড়েছে ঘরে।

'ওঠ, ওঠ। আর কত ঘুমাবি? স্কুলে যাবি না?' হাসলেন চাচী। হাসিটা সকালের সোনালি রোদের মতই উজ্জ্বল।

উঠে বসল কিশোর। মুখের কাছে হাত নিয়ে এসে দীর্ঘ হাই তুলল। ঘুমটা যেতে চাইছে না চোখ থেকে। হিংসে হলো চাচীর ওপর। রোজ সকালে এত হাসিখুশি থাকেন কি করে চাচী। তার মনে হতে লাগল ওরকম মেজাজে থাকতে হলে মগজ ভরা বুদ্ধি থাকা দরকার। যার যে জিনিসটার ঘাটতি থাকে সব সময় সেটা নিয়েই মাথা ঘামায় মানুষ।

স্কুল বাসে ওঠার পর অন্য দিনের তুলনায় পরিস্থিতির বিশেষ কোন উন্নতি হলো না ওদের বেলায়। সামনের দিকের একটা সীটে জানালার কাছে বসল কিশোর। জায়গা না পেয়ে মুসা আর রবিন চলে গেল পেছনের দিকে।

ব্যাগটা কোলের ওপর রেখে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল কিশোর। দিনটা

মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আছে। ধূসর, মেঘে ঢাকা ভারী আকাশ। বৃষ্টির সম্ভাবনা। গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের মাথায় হালকা কুয়াশা।

ফিরে তাকাল সে। পাশের সীটে বসেছে শারিয়া আর রয়। ওদের ক্লাসের দু'জন সবচেয়ে ভাল ছাত্র। নিজের অজান্তেই গুঙিয়ে উঠল সে। 'দা নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার ক্রসওয়ার্ড পাজল নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে ওরা।

ভাল ছাত্র বলে দু'জনের খুব অহঙ্কার। প্রতিটি সূত্র এত জোরে জোরে বলছে, যাতে বাসের সবাই শুনতে পায়। বুঝতে পারে ওরা টাইমসের ক্রসওয়ার্ড পাজলের মত জটিল জিনিসের সমাধান করছে।

ক্লাসের আর কেউ এর সমাধান করতে পারে না, তিক্তকণ্ঠে ভাবল কিশোর। অসম্ভব কঠিন। সেজন্যেই বাসে উঠেই প্রতিদিন এটা নিয়ে মাথা ঘামানো শুরু করে যেন সবাইকে, বিশেষ করে কিশোরদেরকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে যে ওরা কতখানি বোকা।

'হাই কিশোর,' ডেকে বলল রয়, 'এ জিনিসটা ঠিক বুঝতে পারছি না। সাহায্য করবে?'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে পিত্তি জ্বালানো হাসি হাসল শারিয়া, 'আমরা বোকা বনে গেছি।'

কিশোরের বলতে ইচ্ছে করল, বোকা বনলে বনেই থাকো না। কিন্তু আরেকটা জিনিস মনের কোণে খচখচ করছিল বলেই আগ্রহী চোখে ফিরে তাকাল। ওষুধে কাজ হয়েছে কিনা, ওরা বুদ্ধিমান হয়েছে কিনা বোঝা দরকার।

রয় জিজ্ঞেস করল, 'এমন একটা বোকা গাধার নাম বলো তো, যেটার বানান সাত অক্ষর দিয়ে হয়।'

'গাধা তো এক রকমই হয়,' জবাব দিল কিশোর। 'আর সেটার বানান তিন অক্ষরে...'

'উঁহু,' আঙুল নাড়ল রয়, 'এই গাধাটার বানান সাত অক্ষর দিয়েই হয়।'

হেসে কুটিকুটি হতে লাগল শারিয়া।

এটা আমার মস্ত সুযোগ, কিশোর ভাবছে, মগজটা বুদ্ধিমান হয়েছে কিনা বোঝার। বহু সময় তো পার হয়েছে। এতক্ষণে ওষুধে ক্রিয়া করে ফেলার কথা। ইস, আঙ্কেল জ্যাকের ফরমুলাটা যদি কাজ করত! জবাবটা কি হবে, ভাবতে লাগল সে।

'পারছ না?' হাসতে হাসতে বলল রয়। 'দাঁড়াও, সূত্র দিয়ে দিই। দেব?'

ফ্যালফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর।

'ঠিক আছে, দিচ্ছি,' রয় বলল। 'কে-আই-এস-এইচ...'

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল শারিয়া, 'ও-আর-ই।'

প্রচণ্ড রসিকতায় মজা পেয়ে হো হো করে হেসে উঠল দু'জনে। ওদের সঙ্গে যোগ দিল আরও কয়েকজন ছেলেমেয়ে। শুঁটকি টেরি আর তার বন্ধুরাও রয়েছে সেই দলে।

রাগে, হতাশায়, দুঃখে চোখে পানি চলে এল কিশোরের। সীটের মধ্যে এলিয়ে

পড়ল। দৃষ্টি জানালার বাইরে। ভেসে বেড়ানো কুয়াশা আর ধূসর আকাশ মনটা আরও খারাপ করে দিল তার।

এত বোকা কি করে হয়ে গেলাম আমি! ভাবছে সে। এতটাই বোকা! মগজটাতে কি হলো আমার!

পেছনের সীট থেকে শোনা গেল আচমকা রবিনের চিৎকার। 'হায় হায়, আমার ব্যাগ!'

ফিরে তাকাল কিশোর। 'কি হয়েছে, রবিন?'

'আমার স্কুল ব্যাগ,' জবাব দিল রবিন। 'আনতে ভুলে গেছি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুসা বলল, 'আমি ব্যাগ এনেছি, কিন্তু টিফিন আনিনি। ভুলে গেছি। লাঞ্চের সময় খাব কি?'

সীটের সারির মাঝখান দিয়ে বাসের দুলুনির সঙ্গে সঙ্গে দুলতে দুলতে এগোল রবিন। চিৎকার করে অনুরোধ করতে লাগল ড্রাইভারকে, 'আমার ব্যাকপ্যাক, বই-খাতা, সব বাড়িতে ফেলে এসেছি। প্লীজ, বাসটা ঘোরান। ফিরিয়ে নিয়ে চলুন। প্লীজ!'

'সরি,' নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দিল ড্রাইভার। বিশালদেহী একজন মোটাসোটা মহিলা। ঠোঁট থেকে ঝুলছে একটা দাঁত খোঁচানোর কাঠি। ফিরেও তাকাল না রবিনের দিকে।

'কিন্তু আমার জিনিসগুলো তো দরকার,' মরিয়া হয়ে বলতে লাগল রবিন। 'নইলে, নইলে ক্লাস করব কি করে? স্কুলে গিয়ে কি করব?'

মুসাও উঠে এসেছে তার পেছন পেছন। ড্রাইভারকে অনুরোধ করতে লাগল সে-ও।

'সরি!' নির্বিকার কণ্ঠে একই জবাব দিল মহিলা।

মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল কিশোরের। আরও দমে গেল। এত বোকা তো ছিল না ওরা। হঠাৎ করে এমন কি ঘটে গেল যে মগজের এই অবস্থা হয়ে গেল?

দিনকে দিন খারাপের দিকেই যাচ্ছে। ভাল হওয়ার কোনই লক্ষণ নেই।

তার মনে হতে লাগল, আজকে বাসে ওঠার পর থেকে যা যা ঘটল এরচেয়ে খারাপ কিছু আর ঘটতে পারে না।

কিন্তু তার ধারণা ভুল।

নয়

ব্ল্যাকবোর্ডে লিখতে লিখতে থেমে গেলেন মিস্টার ক্রেগ। চক হাতে ঘুরে দাঁড়ালেন। 'কি হলো, কিশোর? এত হাসি কিসের?'

ক্লাসের সবগুলো চোখ এখন কিশোরের দিকে।

হাসি থামানোর চেষ্টা করছে কিশোর। কিন্তু এমন একটা ছবি ওর হাতে ধরিয়ে দিয়েছে টেরির দোস্ত কডি, না হেসে থাকতে পারছে না সে। তাকালেই হাসি। মিস্টার ক্রেগের কিম্ভূত একটা ছবি এঁকেছে কডি। নাক দিয়ে দুটো কালো ক্রিমি বেরিয়ে আসছে।

ছবির নিচে টেরি ক্যাপশন লিখে দিয়েছে: **পেট পচা। তাই ক্রিমিও পেটে থাকতে চায় না।**

এই লেখাটাই বেশি হাসাচ্ছে কিশোরকে। ছবিটা দেখে তার মনে হচ্ছে: শিল্পী বটে কডি! ছবি আঁকায় ওর যে এত ভাল হাত, কই জানা ছিল না তো!

অংক করাচ্ছেন মিস্টার ক্রেগ। সারা ক্লাসের মনোযোগ সেদিকেই ছিল। পিনপতন নীরবতা। কেবল ব্ল্যাকবোর্ডে মিস্টার ক্রেগের চক ঘষার কিঁচকিঁচ শব্দ। এর মাঝে কিশোরের হো হো করে হেসে ওঠাটা যে কতটা বেমানান লেগেছে, ভাবতেই এখন সিঁটিয়ে গেল সে।

গাধা! গাধা আর কাকে বলে!

এগিয়ে এলেন মিস্টার ক্রেগ। কিশোরের কাছে এসে দাঁড়ালেন। তার হাতের ছবিটার দিকে তাকালেন।

আচমকা হাত বাড়িয়ে কেড়ে নিলেন ছবিটা। দেখার জন্যে চোখের সামনে নিয়ে গেলেন।

ঢোক গিলল কিশোর। মুখ তুলে তাকাল টিচারের দিকে। হাসি নেই তার মুখে। ভীষণ গম্ভীর।

আরও নীরব হয়ে গেছে ঘরটা। নিঃশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছে।

'তুমি এঁকেছ?' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার ক্রেগ। ফিসফিসানির মত শোনা গেল তাঁর কণ্ঠ।

'না,' কোনমতে জবাব দিল কিশোর। কান ঝাঁ-ঝাঁ করছে। ঘাড় গরম হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারছে লাল হয়ে যাচ্ছে মুখ।

'হুঁ। কে এঁকেছে তাহলে?' মোলায়েম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার ক্রেগ।

'অ্যাঁ!...' কডির কথা বলবে কিনা ঠিক করতে পারছে না কিশোর। 'জানি না!'

'আমার ছবি নাকি?' মিস্টার ক্রেগের প্রশ্ন।

'তা-তাও তো বুঝতে পারছি না, স্যার,' বলেই হা-হা করে হেসে উঠল কিশোর। আটকাতে পারল না হাসিটা।

গাধা! মস্ত গাধা! মনে মনে গাল দিল নিজেকে।

নীরবতা নেই আর ঘরে। সবাই হাসছে এখন। মিস্টার ক্রেগ বাদে।

হাসি থামার অপেক্ষা করতে লাগলেন তিনি। তারপর ছবিটা কিশোরের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আঁকাটা ঠিক হয়নি। আমার চুল আরও লম্বা। নাকটা আরও খাটো।'

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল কিশোর। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আল্লাহ্ বাঁচিয়েছেন আমাকে, ভাবল। মিস্টার ক্রেগ ধমক দেননি। স্কুল ছুটির পর থাকতে বলেননি।

শাস্তি দেননি। বড় বাঁচা বেঁচে গেলাম।

কিন্তু নিঃশ্বাসটা একটু আগেভাগেই ফেলেছে কিশোর। তখনও অনেক কিছু বাকি।

'ক্লাসটাকে যখন আজ এতটাই সরগরম করে তুলতে পারলে, কিশোর পাশা,' মিস্টার ক্রেগ বললেন, 'যাও না, ব্ল্যাকবোর্ডে গিয়ে সবাইকে দেখিয়ে দাও সমীকরণটা কি ভাবে করতে হবে।'

'সমীকরণ? আমি?'

বুকের মধ্যে হাতুড়ির বাড়ি পড়া শুরু হলো কিশোরের। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে দেখে পায়ে শক্তি পাচ্ছে না। কোনমতে টলতে টলতে এগিয়ে গেল ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে।

সমীকরণটা পড়তে গিয়ে মাথা চুলকানো শুরু করল।

আরও একবার ভাবল মগজ উন্নত করার ওষুধটার কথা। এখনও কি ওষুধের কার্যকারিতা শুরু হওয়ার সময় হয়নি?

ইস্, যদি জেনে যেত কি করে সমাধান করতে হবে সমীকরণটার? কি মজাই না হতো। খসখস করে লিখে যেত মিস্টার ক্রেগ আর সহপাঠীদের বিস্মিত চোখের সামনে। ওকে আর বোকা বলার সাহস পেত না কেউ। বোকা তো সে ছিলও না। কিন্তু কেন যে···

ওষুধে কি কাজ শুরু করেছে?

যদি খালি···যদি খালি···

চকে লিখে রাখা অংকগুলোর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেমন যেন অন্য রকম লাগতে শুরু করল তার।

মনে হলো যেন একটা তীব্র বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল সমস্ত দেহে।

খাড়া হয়ে উঠল হাতের লোম। ভয়ে না মগজের কোন প্রতিক্রিয়ার কারণে, বুঝতে পারল না।

পারবে সে, বুঝে গেল। সমাধান করে ফেলতে পারবে সমীকরণটার।

'কি হলো, কিশোর? চুপ করে আছো কেন?' পেছন থেকে বললেন মিস্টার ক্রেগ।

অক্ষর আর নম্বরগুলোর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল সে, 'কোনটার সমাধান করব, স্যার? কিভাবে?'

হেসে উঠল সারা ক্লাস। ব্যঙ্গের হাসি।

'ঠিক আছে, প্রথমে এক্স থেকেই শুরু করি,' গলা কাঁপছে কিশোরের।

একটুকরো চক তুলে নিয়ে লিখতে আরম্ভ করল সে।

লিখতে গিয়ে বেশি চাপ দিয়ে চকই ভেঙে ফেলল। অর্ধেকটা চক উড়ে গিয়ে পড়ল মেঝেতে। তাকাল না সে।

বুকের মধ্যে কাঁপছে। হচ্ছে তো অংকটা?

অদ্ভুত এক ভয়ের অনুভূতি। এ রকম অনুভূতি জীবনে হয়নি তার।

অবশেষে লেখা শেষ হলো। ফিরে তাকাল মিস্টার ক্রেগের দিকে। অনিশ্চিত

ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'হয়েছে, স্যার?'

বোর্ডের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোয়াল শক্ত হয়ে গেল মিস্টার ক্রেগের মুখ।

কঠিন হয়ে গেল দৃষ্টি।

অস্থির ভঙ্গিতে চুলে আঙুল চালালেন টিচার। চঞ্চল চোখের মণি দ্রুত ঘুরছে ব্ল্যাকবোর্ডের লেখাগুলোর ওপর।

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করলেন তিনি। 'অবিশ্বাস্য!'

হাসিটা চওড়া হলো কিশোরের।

ঢোক গিললেন মিস্টার ক্রেগ। চোখের পাতা সরু করে আনলেন। 'এগুলো কি করলে? এতক্ষণ ধরে লিখলে, কিছুই তো হয়নি।'

'তারমানে, স্যার?' হাসি মুছে গেল কিশোরের মুখ থেকে, 'হয়নি?'

'উঁহু!' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন টিচার। 'যে ভাবে লেখা শুরু করলে, আমি তো ভাবলাম পেরেই ফেলবে···কিন্তু···' কথাটা শেষ হলো না তাঁর।

'তারমানে, স্যার···ভুল?' ঢোক গিলল কিশোর। ভাঙা ভাঙা স্বর বেরোল কোলাব্যাঙের মত।

'পুরোপুরি ভুল,' হতাশ ভঙ্গিতে জানালেন মিস্টার ক্রেগ। 'শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।'

ফুটো বেলুনের মত চুপসে গেল কিশোর। তবে কেউ আর এখন হাসছে না তার দিকে তাকিয়ে। সবারই যেন দুঃখ হচ্ছে তার জন্যে।

'কিশোরকে কেউ সাহায্য করতে পারবে?' মিস্টার ক্রেগ বললেন। 'রবিন, মুসা—তোমরা তো কিশোরের বন্ধু। পারবে তার অংকটা করে দিতে?'

'না, স্যার,' জবাব দিল রবিন। 'আমি আমার বইপত্রই আনতে ভুলে গেছি। তা ছাড়া এই চ্যাপ্টারটা আমি পড়িওনি।'

মাথা চুলকে মুসা বলল, 'আমি, স্যার, আমার লাঞ্চবক্স আনতেই ভুলে গেছি।'

দশ

জানালার ঠিক বাইরেই ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ঘরের ভেতরে নজর রেখেছে দুই জোড়া চোখ।

মাজুলের দিকে ঘুরল গাজুল। 'নাহ্, এই অপদার্থগুলোকে দিয়ে হবে না। তিনটেই গাধা, গাধা, গাধা!'

বিরক্তিতে চোখ-মুখ কুঁচকে ফেলল সে। থু থু করে থুতু ফেলল মাটিতে।

'তারমানে মগজশক্তি রসায়নেও কোন কাজ করছে না?' জানালা দিয়ে আবার ক্লাসরুমের ভেতরে তাকাল মাজুল।

'উঁহু, করছে না। মানুষ হলো একেবারে নিচু জাতের প্রাণী। বুদ্ধিশুদ্ধি বলতে কিচ্ছু নেই ওদের।'

'কি আর করা,' মাজুল বলল। 'অকারণে আর এদের পেছনে লেগে না থেকে চলো আর কাউকে খুঁজি। এ স্কুলের কোনটাকে দিয়েই মনিবের কোন কাজ হবে না। বুদ্ধিমান মানুষ দরকার আমাদের। বুদ্ধিমান গোলাম।'

'মগজের ওষুধটা তো কাজ করছে না, আঙ্কেল,' টেলিফোনে ককিয়ে উঠল রবিন।

'তাঁকে বলো, মগজ খুলছে না আমাদের,' পাশে থেকে বলে দিল কিশোর।

'বলো, আগের মতই বোকা রয়ে গেছি,' মুসা বলল।

কিশোরের ঘরে বসে কথা বলছে ওরা।

'তোদেরকে ধৈর্য ধরতে বলেছিলাম,' আঙ্কেল বললেন। গবেষণাগারে কোনও ধরনের মেশিন চলছে। সেটার গর্জনকে ছাপিয়ে চিৎকার করে কথা বলতে হচ্ছে তাঁকে।

'কিন্তু আমরা তো ঠিকঠাকমতই ওষুধ খেয়েছি, বলো না,' কিশোর বলল। 'কাজ হচ্ছে না কেন? যা ভয়ঙ্কর একটা দিন কাটিয়েছি···আর···আর···'

'বরং আগের চেয়ে বোকা হয়ে গেছি,' ফোনে আঙ্কেলকে জানাল রবিন।

'ওটা তোর ভুল ধারণা,' আঙ্কেল জবাব দিলেন। 'তা ছাড়া এ ধরনের মগজ উন্নয়নকারী ওষুধগুলো রাতারাতি কাজ করে না। রক্তের সঙ্গে পুরোপুরি মিশে যেতে প্রচুর সময় নেয়। তোদেরকে এখন···'

মেশিনের শব্দ থামল।

'কিসের শব্দ হচ্ছিল, আঙ্কেল?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'ব্লেন্ডার মেশিন,' আঙ্কেল জানালেন। 'গাজরের রস মেশাচ্ছি।'

'কিন্তু···আমরা কখন বুদ্ধিমান হব?' রবিন নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। 'কালকে আমাদের অংক পরীক্ষা। আমরা চাইছি ভাল একটা গ্রেড পেতে।'

'ভাল গ্রেড তো পরের কথা,' কিশোর বলল। 'পাস করব কিনা সন্দেহ। আমি শুধু পাস করলেই খুশি।'

ঘাড় কাত করে মুসাও কিশোরের সঙ্গে একাত্ম হলো। সেকথা আঙ্কেলকে জানাল রবিন।

'পাস করবে না মানে?' আঙ্কেল বললেন। 'অবশ্যই পাস করবে। কি বলেছিলাম তোদের, ভুলে গেছিস? ভাল করে পড়ালেখা করতে হবে। বেশি বেশি করে পরিশ্রম করতে হবে। ওষুধটার কথা মন থেকে উধাও করে দিয়ে একেবারে ভুলে যেতে হবে। তারপর দেখ না, কি ভাবে কাজ করছে। আগামীকালকের পরীক্ষার জন্যে ভাবনা নেই। পাস করে যাবি।'

'কিন্তু,' মাথা চুলকাল রবিন, 'এতক্ষণেও কি রক্তে মিশে যায়নি?'

'বললাম তো ওষুধটার কথা ভুলে যেতে,' আঙ্কেল জ্যাক বললেন। 'কাল আবার ফোন করিস আমাকে। আমি জানি, কালকে তোরা ভাল খবর দিতে পারবি।'

তাঁকে ধন্যবাদ আর গুড-বাই জানিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল রবিন।

'ভাল খবর,' তিক্তকণ্ঠে বিড়বিড় করল কিশোর। মেঝেতে রাখা ব্যাকপ্যাকটাতে ধাঁ করে এক লাথি মারল, যেন সমস্ত দোষ ওটার। 'ভাল খবরটা কি আকাশ থেকে পড়বে? অংকে তো গোল্লা পাব।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। 'কোন চ্যাপ্টারটা পড়তে হবে তাই তো জানি না।'

'স্কুলের কাউকে ফোন করে জেনে নেব নাকি?' রবিন বলল। 'রয়, কিংবা শারিয়া, কিংবা অন্য কেউ—বলব আমাদের সঙ্গে এসে বসে পড়তে?'

'মাথা খারাপ নাকি তোমার?' কিশোর বলল। 'ওরা আমাদের সঙ্গে বসে কস্মিনকালেও পড়বে না। আমাদের বোকামিকে ওরা রীতিমত ভয় পায়, এড়িয়ে চলে। বুঝতে পারো না সেসব?' ব্যাকপ্যাকে আবার লাথি মারতে গিয়ে আঙুলে পেল ব্যথা। আঁউ করে উঠল।

'এ সব রাগারাগি আর চিন্তা-ভাবনা করার চেয়ে এসো বসে বসে পড়ি,' রবিন বলল। 'আঙ্কেল কি করতে বলেছেন, শুনলে না? মন দিয়ে পড়তে বলেছেন। ওষুধের কথা ভুলে যেতে বলেছেন।'

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। 'বের করো তো দেখি অংক বইটা। আর রিভিউ শীটটা।'

'গলাটা শুকিয়ে গেছে,' মুসা বলল। 'কোকটোক কিছু আনো না।'

'যাচ্ছি,' বলে দরজার দিকে রওনা হলো কিশোর।

বারান্দায় বেরিয়েই 'উহ্' করে এক চিৎকার দিয়ে বুক চেপে ধরল।

'কি হলো, কি হলো!' বলে দৌড়ে এল মুসা ও রবিন।

হাসি শোনা গেল গলির মাথা থেকে। বলে উঠল হাসি হাসি একটা বালককণ্ঠ, 'ডার্টটা এত জোরে আঘাত করবে বুঝতে পারিনি!'

জ্বলন্ত চোখে সেদিকে তাকাল কিশোর। চিৎকার করে উঠল, 'তুমি কখন এলে?'

রবিন আর মুসাও বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে। বারান্দার মাথায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল আট বছর বয়েসী ছেলেটাকে। ওর নাম ডন। মেরিচাচীর বোনের ছেলে। ওর বাবা আইব্রাম হেনরি স্টোকার অনেক বড় বিজ্ঞানী। অ্যারিজোনায় থাকে ডনরা। মাঝে মাঝেই বেড়াতে আসে সে। বেশির ভাগ সময়ই একা আসে।

'কোথায় পেলে ওই ডার্ট?' রাগে আবার চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'ডার্ট কোন খেলনা জিনিস হলো না। আরেকটু···আরেকটু হলেই তো খুন করে ফেলেছিলে আমাকে!'

'না, তা করব কেন? এগুলো খেলনা ডার্ট,' এগিয়ে আসতে আসতে জবাব দিল ডন।

'কিন্তু ব্যথা তো কম লাগল না,' রাগ যাচ্ছে না কিশোরের। 'আর লাগালেও ঠিক হৃৎপিণ্ডের ওপরে।'

'তাই তো লাগাব,' মেঝে থেকে ডার্টটা কুড়িয়ে নিতে নিতে নির্বিকার ভঙ্গিতে জবাব দিল ডন। 'তাতে পয়েন্ট বেশি। পঞ্চাশ পয়েন্ট। তবে সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট মাথায় লাগাতে পারলে। মাথায় একশো। পেটে তিরিশ। হাতে আর পায়ে দশ পয়েন্ট করে।'

'ভাগো এখান থেকে!' ধমকে উঠল কিশোর। বুকের আহত জায়গাটা ডলতে ডলতে বলল, 'আবার কেন মরতে এসেছ এখানে? একা এলে নাকি?'

কিশোরের ধমকে হাসি মুছল না ছেলেটার। বরং মজা পাচ্ছে। তার কাজ সে করে ফেলেছে। 'হ্যাঁ, একা। থাকব কিছুদিন। বাবা গেছে বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে। ফিরতে দেরি হবে।'

'তারমানে জ্বালিয়ে মারবে!' বিড়বিড় করল কিশোর। 'নিজের জ্বালাতেই বাঁচি না...'

তার কথা যেন কানেই ঢুকল না ডনের। মুসার দিকে তাকাল, 'ডার্ট ছোঁড়াছুঁড়ি খেলবে নাকি, মুসাভাই?'

'নাহ্,' শুকনো কণ্ঠে জবাব দিল মুসা। 'কালকে অংক পরীক্ষা। পড়তে হবে।'

'পরীক্ষা দিয়ে আর কি করবে। ফেল করবে জানা কথা। তারচেয়ে এসো, ডার্ট খেলা যাক...'

ধৈর্য হারাল কিশোর। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'তুমি যাবে এখান থেকে!'

চমকাল না ডন। স্নায়ুর জোর সাংঘাতিক। ভুরু কুঁচকে কিশোরের দিকে তাকাল, 'কি হয়েছে তোমার, কিশোরভাই? অমন করছ কেন?'

জবাব দিল না কিশোর।

কিন্তু তার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বোধহয় বুঝতে পারল ডন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়। আর কিছু না বলে চলে গেল সে।

এগারো

পরদিন স্কুলে অংক পরীক্ষার পর কিশোর আর রবিনের কাছে এসে দাঁড়াল মুসা। 'পরীক্ষাটা কিন্তু খারাপ হয়নি, যাই বলো।'

কাঁধ ঝাঁকাল কিশোর। 'সবগুলো প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছি আমি। এটাকে শুভলক্ষণই বলতে পারো।'

'আমার অবশ্য কিছু কিছু জায়গায় ভাবতে হয়েছে,' রবিন বলল। 'তিন নম্বর সমীকরণটা তো রীতিমত ভাবনায় ফেলে দিয়েছিল। তবে সমাধান করে ফেলেছি। ঠিক হলো কিনা বোঝা যাবে মিস্টার ক্রেগের দেখার পর।'

'তবে কেন যেন মনে হচ্ছে,' কিশোর বলল, 'এবার পাস করে ফেলব। যদিও শিওর হতে পারছি না।'

ওদের পেছনে রয়ের সঙ্গে কথা বলতে শুনল শারিয়াকে। 'একেবারেই সহজ।'

'পানির মত,' রয় জবাব দিল।

অকারণেই জোরে জোরে হাসতে লাগল দু'জনে।

তিন গোয়েন্দাকে ব্যঙ্গ করল কিনা ওরা বোঝা গেল না। কিন্তু রাগ হতে থাকল মুসার। শুঁটকির চেয়ে কোন অংশেই ভাল না এই ছেলেমেয়ে দুটোও। এখন ওদের সময় খারাপ, তাই কিছু বলল না।

'আরও কঠিন অংক দিতে পারেন না, স্যার?' ডেকে বলল রয়।

'দেখা যাক, পরের বার,' জবাব দিলেন মিস্টার ক্রেগ।

'কিশোর,' হেসে জিজ্ঞেস করল রয়, 'তোমাদের কেমন হলো?'

'আশা করি তোমাদের চেয়ে ভাল হবে,' গম্ভীর স্বরে জবাব দিল কিশোর।

বিশ্বাস করল না রয় কিংবা শারিয়া। হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল দু'জনে।

'পরীক্ষার ফল জানাব এখন,' পরদিন বিকেলে ঘোষণা করলেন মিস্টার ক্রেগ।

ডেস্কের সারির মাঝখান দিয়ে হেঁটে হেঁটে খাতাগুলো বিতরণ করতে লাগলেন তিনি।

'সব মিলিয়ে খুশিই হয়েছি আমি,' মিস্টার ক্রেগ বললেন। 'কঠিন প্রশ্ন করেছিলাম। মোটামুটি সবাই ভাল করেছ তোমরা।'

রয়ের টেবিলের সামনে দাঁড়ালেন তিনি। 'ভাল করেছ, রয়।'

কিশোর ভাবছে, আমি কেমন করলাম? ডেস্কের ওপর দুই হাত রাখা। খুলছে আর মুঠোবদ্ধ হচ্ছে আঙুলগুলো। পাস করেছি তো? শুধু পাস করলেই আমি খুশি।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল মুসা আর রবিনের দিকে। পেছনের সারিতে পাশাপাশি বসেছে ওরা। মুসার কোন ভাবান্তর নেই। লেখাপড়ায় খুব ভাল সে কোনকালেই ছিল না। এখন আরও খারাপ হয়েছে। কিন্তু কিশোর আর রবিনের জন্যে ব্যাপারটা ভীষণ দুঃখজনক। বুদ্ধিমান বলে যারা চিরকাল সবার ঈর্ষার কারণ হতো, আজ তারাই অন্যের করুণার পাত্র। কেন এমন হয়ে গেল, সেটা একটা বিরাট রহস্য কিশোরের কাছে। কিন্তু এতই বোকা হয়ে পড়েছে সে, রহস্যটা উদঘাটনের কথাও ভাবছে না। আর ভেবেও লাভ হবে না। ক্ষমতাই নেই।

অস্বস্তি ভরা চোখে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। কথা বলল না।

খোদা, মনে মনে প্রার্থনা করল কিশোর, কোনমতে যেন পাস করে যাই। ফেল করার লজ্জা আর সহ্য করতে পারছি না। খোদা! খোদা! প্লীজ!

খাতা দেয়া শেষ করলেন মিস্টার ক্রেগ। ডেস্কে ফিরে গেলেন।

'স্যার, আমার খাতাটা?' কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ফিরে তাকালেন মিস্টার ক্রেগ। হাসলেন। 'হ্যাঁ, তোমাদেরটা বাকি আছে। মুসা আর রবিনেরটাও দেব না। ছুটির পরে আমার সঙ্গে দেখা করবে তোমরা তিনজনে।'

সর্বনাশ! একেবারে দমে গেল কিশোর।

নিশ্চয় খারাপ সংবাদ! খুব খারাপ!

ছুটির পর ছেলেমেয়েদের বেরিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলেন মিস্টার ক্রেগ।

সবাই বেরিয়ে গেল। কিশোর, মুসা আর রবিন বাদে।

ওদের খাতা তিনটে বের করলেন মিস্টার ক্রেগ। শক্ত করে ধরে রেখে তাকালেন ওদের দিকে। তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটি করলেন। ভাঁজ পড়ল কপালে।

'তোমাদের জন্যে দুঃখ হচ্ছে আমার, সত্যি,' মোলায়েম কণ্ঠে বললেন তিনি। 'বড় বেশি হতাশ করলে তোমরা আমাকে।'

বারো

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর।

চোখ নামাল রবিন। মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল।

'তারমানে···তারমানে আবার ফেল করলাম!' বিড়বিড় করল মুসা।

জবাব দিলেন না মিস্টার ক্রেগ। লম্বা লম্বা পায়ে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়ালেন তিনি। তাকিয়ে রইলেন মেঘে ঢাকা ধূসর আকাশের দিকে।

'দোষটা বোধহয় আমারই ছিল,' ওদের দিকে পেছন দিয়ে রেখেছেন তিনি। 'ভাল করার জন্যে অনবরত চাপ দিয়ে যাচ্ছিলাম তোমাদের ওপর। মরিয়া হয়ে তাই এ কাজটা করে বসলে।'

আচমকা ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন ওদের দিকে। 'কিন্তু কল্পনাই করতে পারিনি এ ভাবে আমাকে ঠকাবে তোমরা। নকল করে লিখবে।'

'নকল!' বুঝতে পারল না কিশোর।

হাঁ হয়ে গেছে রবিন।

মুসা তাকিয়ে আছে চোখ বড় বড় করে।

'তিনজনেই ভাল করেছ তোমরা,' মিস্টার ক্রেগ বললেন। 'খুব ভাল। প্রতিটি অংকের সমাধান করেছ। একটা অংকও ভুল হয়নি। কি প্রমাণ হয় এতে? দেখে দেখে লিখেছ।' তিনটে খাতা তুলে নিয়ে ওদের দিকে ছুঁড়ে দিলেন তিনি। 'কেন করলে এ কাজ? আমাকে খুশি করার জন্যে নকল ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না?'

'কিন্তু···আমরা তো নকল করিনি!' কিশোর বলল।

'খুব মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করেছি আমরা,' রবিন বলল। 'আর কিছুই করিনি।'

'তাই তো,' মুসা বলল। 'কোন রকম চালাকি করিনি আমরা।'

আসলে তো মগজ উন্নত করার ওষুধ খেয়ে বুদ্ধি বেড়ে গেছে আমাদের, ভাবল কিশোর। কিন্তু টিচারকে বলল না সেকথা।

খাতার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে নম্বর দেখে বিস্ময়ে অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে

আসতে থাকল রবিনের মুখ থেকে। বিশ্বাস করতে পারছে না। তবে কি সত্যি কাজ করেছে মগজ উন্নত করার ওষুধ? বুদ্ধিমান হয়ে গেছে ওরা?

'তোমাদেরকে আমি পছন্দ করি,' মিস্টার ক্রেগের কথা শুনে মুখ তুলে তাকাল রবিন। 'তাই এবার আর প্রিন্সপ্যালের কাছে পাঠালাম না। তবে এরপর আর এ ধরনের অন্যায় করলে কিন্তু আর মাপ করব না।'

'কিন্তু···স্যার···আমরা···' কথা বের করতে পারছে না মুসা।

'সত্যি বলছি, নকলটকল কিচ্ছু আমরা করিনি,' কিশোর বলল।

অধৈর্য ভঙ্গিতে চোখ ওল্টালেন মিস্টার ক্রেগ। আঙুল তুলে নাড়লেন। 'বললাম তো, এবারকার মত মাপ করে দিলাম। এ কাজ কেন করেছ, তা-ও বুঝতে পারছি। দাও, দেখি, টেস্ট পেপারগুলো ছিঁড়ে ফেলি। কাল আবার নতুন খাতা দেব। নতুন প্রশ্নপত্র।'

'কিন্তু, স্যার, আমরা···' বলতে গেল কিশোর।

'বললাম তো, নতুন করে পরীক্ষা দিতে হবে তোমাদের,' কোন কথা শুনতে চাইলেন না মিস্টার ক্রেগ। 'মনোযোগ দিয়ে পড়বে আজ রাতে। যাতে পাস করতে পারো। আজকের কথা তাহলে আর মনে রাখব না আমি।'

টিচারের ধমক আর রাগারাগি নিয়ে মাথাই ঘামাল না ওরা। আনন্দে নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরল।

'বুদ্ধিমান হয়ে গেছি আমরা,' কিশোর বলল। 'মগজের স্থবিরতা কেটে গেছে। বোকামি শেষ।'

'সব আঙ্কেল জ্যাকের কৃতিত্ব,' রবিন বলল। 'তিনিই আমাদেরকে বুদ্ধিমান বানিয়ে দিয়েছেন। ভেবে দেখো, কিশোর, দুনিয়ায় কি একটা সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন তিনি। সমস্ত বোকাদেরকে তো বুদ্ধিমান বানাবেনই, মগজ উন্নত করার ওষুধ বেচে বেচে নিজেও কি পরিমাণ বড়লোক হয়ে যাবেন, কল্পনা করতে পারো?'

'সব বোকাদের নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই,' জবাবটা দিল মুসা। 'আমি শুধু আমাদের কথা ভাবছি। তুমি কল্পনা করতে পারো, স্কুলে সব বিষয়েই "এ প্লাস" পেয়ে গেলে কি একটা সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে যাবে?'

'এখনই অত আশা করে ফেলাটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না,' গম্ভীর সুরে কিশোর বলল। 'সব বিষয়ে "এ প্লাস" পাওয়ার বিষয়টা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলা উচিত। নইলে পরে দুঃখ পেতে হবে। নিশ্চয় আমাদের ভাগ্য ভাল, সব প্রশ্ন কমন পড়েছিল, তাই ওই পরীক্ষাটায় আমরা ভাল করে ফেলেছি। সবগুলোতেই যে এমন করব, তা না-ও হতে পারে। দেখা যাক, আগামী কাল কি হয়।'

'ওটাতেও "এ" পেয়ে যাব,' জোর দিয়ে বলল রবিন, 'এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ নেই আমার। এমনকি সেটা পাওয়ার জন্যে পড়তেও হবে না আমাদের।' মহা উল্লাসে ব্যাকপ্যাকটাকে ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিল সে।

বাকি পথটা যেন উড়ে পেরোল তিনজনে।

রবিনদের বাড়িতে ঢুকল ওরা। লিভিং রূমে ঢুকে রিনিতাকে দেখতে পেল। কতগুলো প্লাস্টিকের টুকরো জোড়া দিয়ে ম্যাপ বানানোর চেষ্টা করছে সে।

'এখনও এই নিয়েই পড়ে আছো,' রবিন বলল। 'এক খেলা খেলতে বিরক্ত লাগে না তোমার?'

'না লাগে না,' রিনিতা জবাব দিল।

মুসা হেসে জিজ্ঞেস করল, 'দেব জোড়া লাগিয়ে?'

'দিলে তো ভালই হতো। কিন্তু তোমরা হাঁদারা কি পারবে? মাথায় গোবর ছাড়া কিছু নেই।'

'দাও তো দেখি,' হাত বাড়াল কিশোর।

'থাক থাক, যেটুকু করেছি, সেটাও নষ্ট করার দরকার নেই,' কিশোরের হাতটা সরিয়ে দিল রিনিতা।

'আরে দিয়েই দেখো না,' রবিন বসে পড়ল রিনিতার পাশে। কিশোর আর মুসাও বসল।

প্রথমেই ইনস্ট্রাকশন শীট—যেটা দেখে দেখে সাজাতে হয়, সেটা ছিঁড়ে কুটি কুটি করল রবিন।

চিৎকার করে উঠল রিনিতা, 'হায় হায়, এ কি করলে! সাজাব কি করে এখন?' কাঁদতে শুরু করল সে।

হেসে উঠল রবিন। 'ওই শীটের আর প্রয়োজন পড়বে না।'

দ্রুতহাতে জোড়া দিতে শুরু করল সে। তাকে সাহায্য করল কিশোর আর মুসা।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্লাস্টিকের মস্ত একটা ওয়ার্ল্ড ম্যাপ তৈরি হয়ে গেল।

চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল রিনিতা। বিশ্বাস করতে পারছে না। তারপর বিস্ময়টা যেন বিস্ফোরিত হলো তার। চিৎকার করে উঠল, 'কি ভাবে করলে!'

'পানির মত সহজ,' হাসতে হাসতে বলল রবিন।

'তুমি কি ভেবেছিলে চিরকালই আমরা হাঁদা থেকে যাব,' হেসে বলল রবিন।

কিশোর কিছু বলল না। নীরবে উপভোগ করতে লাগল ব্যাপারটা।

জানালা দিয়ে চুরি করে পুরো ব্যাপারটাই লক্ষ করল গাজুল আর মাজুল।

মাজুল অবাক, 'তারমানে সত্যি সত্যি ওষুধে কাজ হয়ে গেল!'

হাসিমুখে মাথা ঝাঁকাল গাজুল। 'কেন, নিজের চোখেই দেখলে। যাক, বাঁচা গেল, বাবা। নতুন করে আর কারও খোঁজ করা লাগল না। আমাদের গোলাম আমরা পেয়ে গেছি।'

তেরো

'আঙ্কেল জ্যাক,' টেলিফোনে বলল রবিন, 'শুনলে তুমি বিশ্বাস করবে না।'

রিসিভারে ভেসে এল আঙ্কেল জ্যাকের বিমল হাসি। 'কি বিশ্বাস করব না?'

'অংক পরীক্ষায় আমরা সাংঘাতিক ভাল করে ফেলেছি,' উত্তেজিত কণ্ঠে জানাল রবিন। 'যে ওষুধটা তুমি আমাদের দিয়েছিলে, কাজ করেছে ওটা।'

জোরে জোরে হাসলেন আঙ্কেল। 'আমার কি মনে হচ্ছে জানিস? ওষুধে আসলে কিছু হয়নি। হয়েছে তোদের মনোযোগ দিয়ে পড়ালেখার কারণে।'

রবিনের দুই পাশে দাঁড়ানো মুসা আর কিশোর। টেলিফোনে কি বলছেন আঙ্কেল শোনার জন্যে রিসিভারের কাছে ঝুঁকে এল দু'জনে।

রবিনের কাছ থেকে রিসিভারটা কেড়ে নিয়ে কিশোর বলল, 'উঁহু, পড়ালেখার জন্যে কিচ্ছু হয়নি। আপনার ওষুধই আমাদেরকে বুদ্ধিমান বানিয়ে ছেড়েছে। নিশ্চিন্তে আপনি এটাকে বোতলজাত করে বাজারে ছাড়তে পারেন। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ধনী হয়ে যাবেন।'

'হুঁ, সে-রকম ওষুধ ছাড়তে পারলে সত্যিই হব।...তবে তোমাদের উপকার হয়েছে শুনে খুশি হলাম,' আঙ্কেল জ্যাক জবাব দিলেন। 'কিন্তু তাই বলে পড়ালেখা যেন আবার বন্ধ করে দিও না। পরীক্ষায় ভাল করার জন্যে ওটাই হলো সবচেয়ে জরুরী।'

আরও কিছুক্ষণ উত্তেজিত তিন কিশোরের সঙ্গে কথা বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন আঙ্কেল জ্যাক। স্ত্রীর দিকে ফিরলেন।

'অংক পরীক্ষায় অসাধারণ ভাল করে ফেলেছে ওরা,' হাসতে হাসতে বললেন তিনি। 'আত্মবিশ্বাস মানুষকে কোথায় নিয়ে যায় এই ঘটনাটাই তার প্রমাণ। আমি দিলাম ওদেরকে আঙুরের রস, আর ওরা ভাবছে...! হাহ্ হাহ্ হা!'

পরদিন স্কুল বাসে চড়ার আগে দুই সহকারীকে বলল কিশোর, 'সাবধান, আমরা যে বদলে গেছি এটা যাতে কেউ বুঝতে না পারে। বুঝতে দেয়া ঠিক হবে না।'

কিন্তু রবিন সামলে নিলেও মুসা সামলাতে পারল না। বুদ্ধিমান হয়ে গিয়ে তার আচার-আচরণই পাল্টে গেছে।

গাড়িতে সীটে বসে নিত্যদিনকার মতই নিউ ইয়র্ক টাইমস ক্রসওয়ার্ড পাজলের সমাধান করছে ওরা। আজ ওদের পাশের সীটে বসেছে মুসা। ইচ্ছে করেই। জানে, সে, রবিন কিংবা কিশোর যে-ই ওদের পাশে বসুক না কেন, সমস্যায় ফেলে মজা করতে চাইবে। রোজই তাই করে। ওরা যে ভাল ছাত্র, সেটা যে কোন ভাবেই হোক জাহিরের চেষ্টা করে।

অপেক্ষা করতে লাগল মুসা।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। ফিরে তাকাল রয়। জিজ্ঞেস করল, 'এই, বলো তো চার অক্ষরের একটা গাধার নাম, যেটার প্রথম অক্ষর "এম" দিয়ে শুরু।'

হেসে উঠল পাশে বসা শারিয়া। টেরিয়ার ডয়েল সহ আরও অনেক ছেলেমেয়েই হেসে উঠল।

আজ রয়কেই গাধা মনে হচ্ছে মুসার। রোজ একই রকম প্রশ্ন করে। নতুনত্ব নেই। কোন রকম জড়তা কিংবা আড়ষ্টতা না রেখে শান্তকণ্ঠে জবাব দিল মুসা, 'চার অক্ষরের পারব না, তবে তিন অক্ষরের গাধার নাম বলতে পারব। যেটার প্রথম অক্ষর "আর" দিয়ে শুরু।'

মুহূর্তে হাসি মুছে গেল রয়ের। কালো হয়ে গেল মুখ। 'বাহ্, কালটুসটার তো মুখ খুলে গেছে আজ। সেই সঙ্গে একটু যদি বুদ্ধি খুলত।'

টান দিয়ে রয়ের হাত থেকে ভাঁজ করা খবরের কাগজটা কেড়ে নিল মুসা।

'আরে আরে কি করছ!' চিৎকার করে উঠল শারিয়া। 'দাও, দাও।'

দিল না মুসা। 'তোমরা যে জিনিসটার সমাধান করতে পারো না, দেখাও আমাকে। বলে দিচ্ছি। নাকি সবই বলে দেব?'

বলপেন বের করে কাগজের ওপর লিখতে শুরু করল মুসা। এত দ্রুত, চোখ কপালে উঠে গেল শারিয়া আর রয়ের।

খসখস করে লিখে কাগজটা ফিরিয়ে দিল মুসা। 'নাও, দেখো এবার।'

কাগজের দিকে তাকানোর জন্যে ঝুঁকে এল রয় ও শারিয়া। মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। অস্ফুট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল শারিয়ার মুখ থেকে। চোখ বড় বড় করে তাকাল রয়। চোখে অবিশ্বাস। 'কি করে করলে?'

হাসিমুখে কাঁধ ঝাঁকাল মুসা। 'সহজ। একেবারেই সহজ। অক্ষরজ্ঞান যদি ভাল থাকে তোমার, ক্রসওয়ার্ড পাজল মেলানো কোন ব্যাপারই না।'

স্কুলে সেদিন ক্লাসে তিন গোয়েন্দাকে অংক পরীক্ষায় বসালেন মিস্টার ক্রেগ। বাকি সবার জন্যে অন্য পড়া।

তিন গোয়েন্দাকে অভয় দিয়ে বললেন, 'তাড়াহুড়া নেই। ভাবনা-চিন্তা করে সুন্দরমতই জবাব দাও। কোনটা যদি না পারো, ফেলে রাখো, পরে আমার কাছ থেকে জেনে নিও। ঠিক আছে?'

প্রশ্নপত্র আর খাতা নিয়ে যার যার ডেস্কে ফিরে এল কিশোর, মুসা ও রবিন।

ডেকে বললেন মিস্টার ক্রেগ, 'আন্দাজে করলে কিন্তু হবে না। পরে ধরব। কি ভাবে করলে বুঝিয়ে বলতে হবে আমাকে। এগুলো যদি পেরে যাও, আরও কঠিন প্রশ্ন দেয়া হবে। কি, বুঝলে?'

মাথা ঝাঁকাল তিনজনেই।

দশ মিনিট পরই মিস্টার ক্রেগের কাছে টেস্ট পেপার নিয়ে হাজির হলো কিশোর। কিছু কিছু সমীকরণ তিন ভাবে করে দেখিয়েছে সে।

সব প্রশ্নের জবাব দিতে রবিনের লাগল বারো মিনিট, মুসার চোদ্দ। ওরাও কিশোরের মত একই কাজ করেছে। মোট কথা যতভাবে করা যায় এই অংকগুলো,

সব ভাবেই করেছে।

অবাক হয়ে ওদের দিকে তাকালেন মিস্টার ক্রেগ। খাতার দিকে তাকালেন না। 'কি ব্যাপার? পারছ না? খুব কঠিন মনে হচ্ছে?'

'করেছি তো, স্যার?' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর।

খাতার দিকে তাকালেন মিস্টার ক্রেগ। প্রথমে দ্রুত দেখলেন ফলগুলো। তারপর ধীরে ধীরে।

'আ-আবার তো সেই একই কাণ্ড করেছ!' কথা আটকে যেতে শুরু করল মিস্টার ক্রেগের। 'সবগুলোই তো কারেক্ট। ভাল, ভাল। তারমানে সারারাত বসে পড়াশোনা করেছ তোমরা?'

'পড়িইনি, স্যার,' কোন কিছু না ভেবেই বলে ফেলল মুসা। 'বইয়ের দিকেই তাকাইনি একবারও। অংক একটা অতি সহজ সাবজেক্ট।'

স্কুল ছুটির পর রবিনদের বাড়ির পেছনের খোলা জায়গায় বল খেলছে তিনজনে। খেলছে মানে এ ওর কাছে ছুঁড়ে দিয়ে লোফালুফি করছে।

বেশ কয়েক দিন মেঘে ঢাকা থাকার পর মেঘ কেটে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে সূর্য। আকাশের ধূসর রঙ আর নেই। বাতাস চমৎকার। বসন্তকালের মত।

'স্কুল ছুটি হওয়ার আগেই সমস্ত হোমওঅর্ক করে ফেলেছি আমি,' মুসা বলল। রবারের বলটাকে রবিনের দিকে ছুঁড়ে মারল সে।

মিস করল রবিন। ধরতে পারল না। বলটা চলে গেল পাতাবাহারের বেড়ার দিকে। পেছন পেছন দৌড়ে গেল সে।

'কিন্তু তোমাকে তো বলেছিলাম সাবধানে থাকতে,' কিশোর বলল। 'আমরা যে বুদ্ধিমান হয়ে গেছি অত তাড়াহুড়া করে জানান দেয়ার কি প্রয়োজন ছিল? আর মিস্টার ক্রেগের অত ভুল ধরারই বা কি দরকার ছিল?'

'তাই তো,' বল নিয়ে ফিরে এসেছে রবিন। 'যতবার তিনি ভুল করছিলেন, হাত তুলছিল সে।'

'কিন্তু এত ভুল করতে থাকলে না তুলে কি করব?' মুসা বলল। 'বোর্ডে লিখতে গিয়ে ম্যাসাচুসেটস বানানও তিনি ভুল লিখলেন। বলব না? কাউকে না কাউকে তো ভুলটা ধরিয়ে দিতেই হবে। টিচার বলে কি মাপ?'

'কিন্তু, মুসা···' বলতে গেল কিশোর।

শুনল না মুসা। তার কথা বলে গেল, 'সিভিল ওঅর কবে শুরু হয়েছে, সালটা পর্যন্ত তিনি ভুল বললেন। শুধরে দেব না?'

'কিন্তু তোমার বার বার হাত তোলা দেখে কি রকম ভঙ্গি করছিল সবাই খেয়াল করেছ?' রবিন বলল। 'ভাবখানা যেন টিচারের ভুল ধরিয়ে দিয়ে তুমি মস্ত অপরাধ করে ফেলছ। আসলেই তোমার চুপ করে থাকা উচিত ছিল। তোমার ভয়ে শেষে পড়ানোই বাদ দিয়েছেন তিনি। এ রকম পর্যুদস্ত করাটা অবশ্য ঠিক হয়নি তোমার।'

কিশোর আর মুসার মুখে 'ঠিক হয়নি' শুনতে শুনতে রাগ হয়ে গেল মুসার।

এত জোরে ছুঁড়ে মারল বলটা, আবারও ধরতে পারল না রবিন। দৌড় দিল ঝোপের দিকে। বল খুঁজতে ঢুকে পড়ল ঝোপের মধ্যে। খানিক পরেই শোনা গেল তার চিৎকার, 'কিশোর, জলদি এসো!'

'কি হলো?' বলে দৌড় দিল কিশোর। পেছনে ছুটল মুসা।

ওরা দু'জনও ঝোপে ঢুকল।

মাটির দিকে দেখাল রবিন, 'দেখেছ? জুতোর ছাপ।'

ঝুঁকে বসে ভালমত দেখে গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর, 'হুঁ। তাজা ছাপ। অনেক বড় পা। ঘটনাটা কি? আমাদের ওপর নজর রাখছিল নাকি?'

'ওই দেখো,' মুসা বলল, 'ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে ছাপগুলো।'

ছাপ অনুসরণ করে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

পেছনের উঠান পার হয়ে রবিনদের লিভিং রুমের জানালার কাছে এসে শেষ হয়েছে। মাটিতে গভীর হয়ে বসা ছাপগুলো প্রমাণ করে ওখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেছে ছাপের মালিকেরা। উঁকিঝুঁকি মেরেছে ঘরের ভেতর।

আর কোন রকম সূত্র পাওয়া গেল না।

এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর, 'কিন্তু আমাদের ওপর নজর রাখতে এল কে? এবং কেন?'

চোদ্দো

সাতদিন পর।

স্কুলে তার লকারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। ব্যাকপ্যাকে জিনিসপত্র ভরছে। স্কুল ছুটি হয়েছে। বাড়ি যাবে।

উল্টোদিকের লকারের সামনে দাঁড়ানো রয়। হাসিমুখে তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'হাই রয়, দিনকাল কেমন যাচ্ছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে দায়সারা জবাব দিল রয়, 'ভাল।'

'আমাদের বাড়ি যাবে? কম্পিউটার গেম খেলব।'

মুখ বাঁকাল রয়। 'নাহ্।'

'কেন? এসো না, কি হয়েছে,' অনুরোধ করল কিশোর।

কাঁধ ঝাঁকাল রয়। 'উঁহু। তোমার সঙ্গে পারব না। একটা গেমও জিততে পারব না। মগজ অতিরিক্ত খুলে গেছে তোমার, বুদ্ধি বেড়ে গেছে।'

'কিন্তু...'

দড়াম করে লকারের দরজা বন্ধ করে দিয়ে তাড়াহুড়া করে ওখান থেকে সরে গেল রয়।

তাকে ধরতে যাবে কিনা ভাবছে কিশোর, কথা কানে এল। ঘুরে তাকিয়ে দেখে টেরি আর তার দুই দোস্ত টাকি ও কডি। ওপথ দিয়েই যাচ্ছে।

ওদের পথরোধ করল কিশোর। অনুরোধের সুরে বলল, 'টেরি, কেমন আছো? চলো না আমাদের বাড়িতে। খেলবে।'

আঁতকে উঠল টেরি। 'ওরিব্বাপরে! তোমার সঙ্গে? না বাবা, দৈত্যের সঙ্গে খেলতে আমরা রাজি না। এই টাকি, চল চল!'

প্রায় দৌড়ে চলে গেল টেরি আর তার দোস্তরা।

মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে রইল কিশোর। এতটাই বুদ্ধিমান হয়ে গেছে ওরা, অস্বাভাবিক মানুষে পরিণত হয়েছে, সবাই এখন ওদের ভয় পায়।

মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। এ সময় সেখানে এসে হাজির মুসা আর রবিন। ওদেরও মন খারাপ। মুসার মুখ দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলবে।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কেউ আমাদের সঙ্গে খেলতে রাজি হয় না,' করুণ সুরে মুসা বলল।

'যাকে বলি, সেই পালায়,' রবিন বলল। 'সবাই আমাদেরকে বলে ফ্রীক।'

'কেউ কেউ বলে জিন-ভূতের আসর হয়েছে, কেউ বলে কবরস্থানে গিয়ে প্রেতাত্মা ঢুকিয়েছি মগজে···শুনতে শুনতে আর ভাল লাগে না,' মুসা বলল।

'অতিরিক্ত বুদ্ধিমান হয়ে যাওয়াটাও যে এতটা বিপজ্জনক, সেটা তো জানতাম না,' রবিন বলল।

'বিপজ্জনক তো বটেই, প্রচণ্ড দুঃখেরও,' মুসা বলল। 'এরচেয়ে তো বোকা থাকাটাই ভাল ছিল।'

'না, তা ছিল না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'অস্বাভাবিক থাকাটাই বিপজ্জনক, সেটা বোকাই হোক আর বুদ্ধিমানই হোক। তিনজনেরই বুদ্ধি এখন এক রকম হয়ে গেছে আমাদের। কারও চেয়ে কেউ কম নই, তাই নিজেরাও আর আগের মত খেলতে পারছি না। কি যে করব বুঝতে পারছি না!'

বুদ্ধি দিল রবিন, 'চলো, আবার আঙ্কেল জ্যাকের কাছে যাই। তাকে গিয়ে বলি, আমাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিটা ফিরিয়ে দেয়ার কোন ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা।'

'পারলে তো ভালই হতো···' চিন্তিত ভঙ্গিতে ব্যাকপ্যাক পিঠে ফেলল কিশোর।

হলরুম ধরে এক সারিতে এগিয়ে চলল ওরা।

আগে আগে চলছে রবিন।

সামনে দুটো ছায়া পড়েছে হলরুমের মেঝেতে।

ধাক্কা লাগবে ভেবে আচমকা দাঁড়িয়ে গেল রবিন।

তার পিঠের ওপর এসে পড়ল মুসা। 'কি হলো?'

নীরবে হাত তুলে দেখাল রবিন।

একপাশ থেকে বেরিয়ে এল ছায়া দুটো।

'বাবা! মা! তোমরা?' অবাক হলো রবিন।

ওদের দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন মিস্টার ও মিসেস মিলফোর্ড। গম্ভীর থমথমে চেহারা।

পেটের মধ্যে খামচি দিয়ে ধরার মত অনুভূতি হলো রবিনের। কিছু ঘটেনি

তো? জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে, মা?'

'জবাবটা তোমরাই ভাল দিতে পারবে,' এক এক করে রবিন, মুসা ও কিশোরের ওপর দৃষ্টি ঘুরে এল মিস্টার মিলফোর্ডের। রবিনের ওপর এসে স্থির হলো আবার। 'মিস্টার ক্রেগ আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন। মুসার মা-বাবা আর কিশোরের চাচা-চাচীকেও ডেকেছেন।'

'কি করেছ তোমরা?' মিসেস মিলফোর্ড জিজ্ঞেস করলেন।

'কই, কিছু তো করিনি,' জবাব দিল কিশোর।

'কিচ্ছু করিনি আমরা!' রবিন বলল।

'এসো আমাদের সঙ্গে। প্রিন্সপ্যাল মিসেস অ্যান্ডারসনের ঘরে যেতে বলা হয়েছে আমাদের।'

'মিসেস অ্যান্ডারসন?' ভুরু কুঁচকাল মুসা। 'তাঁর ওখানে যাব কেন? কোন অপরাধ তো করিনি আমরা। হচ্ছেটা কি?'

ইচ্ছে না থাকলেও যেতে হলো। দশ সেকেন্ড পর পিন্সপ্যালের অফিসের সামনের ঘরে ঢুকল ওরা। সামনের ঘরটা খালি। চারটে প্রায় বাজে। কর্মচারীদের সবার ছুটি হয়ে গেছে। বাড়ি চলে গেছে সেক্রেটারিরা।

পেছনের ঘর, অর্থাৎ মিসেস অ্যান্ডারসনের অফিসের দরজার দিকে এগোল সবাই। ঢোকার আগেই দরজায় বেরিয়ে এলেন তিনি। স্বাগত জানালেন ওদের। ডেকে ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে ঘরের মাঝখানে একটা লম্বা টেবিলের সামনে বসা দেখা গেল কিশোরের চাচা-চাচী আর মুসার বাবা-মা'কে। টেবিলের একধারে বসা মিস্টার ক্রেগ। আরও একজন লোক আছেন সেখানে, মিস্টার বেলসন। স্কুল পরিচালকদের সভাপতি। সবাই গম্ভীর।

মিসেস অ্যান্ডারসন এমনিতে হাসিখুশি, আন্তরিক, সবার সঙ্গেই উষ্ণ ব্যবহার করেন। কিন্তু এখন তিনিও গম্ভীর। রবিনের বাবা-মা'কেও বসতে অনুরোধ করলেন তিনি।

শীতল দৃষ্টিতে তিন গোয়েন্দার দিকে তাকালেন মিস্টার বেলসন। ফ্যাকাসে চামড়া, চকচকে টাক, কঠোর চেহারা। ধূসর সুট আর সরু নীল টাই পরেছেন। যতবার দেখেছে তাঁকে গোয়েন্দারা, এই একই পোশাকে। এগুলো ছাড়া যেন আর কোন কাপড় নেই তাঁর।

বাইরের ঘর আর অফিসের মাঝের দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে এলেন মিসেস অ্যান্ডারসন। ঘুরে গিয়ে বসলেন নিজের চেয়ারে। নিজের দুই হাতের দিকে তাকালেন। মুখ তুললেন। আসার জন্যে ধন্যবাদ দিলেন সবাইকে। ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারছে কিশোর, অস্বস্তিতে ভুগছেন মিসেস অ্যান্ডারসন।

'কি ভাবে কথাটা শুরু করব ঠিক বুঝতে পারছি না,' অবশেষে শুরু করলেন তিনি। 'অদ্ভুত এক সমস্যায় পড়ে গেছি আমরা।'

পনেরো

'সমস্যা!' মিসেস মিলফোর্ড বললেন। ভ্রূকুটি করলেন ছেলেদের দিকে তাকিয়ে।

'গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে কোন রকম অঘটন ঘটিয়েছে নাকি ওরা?' জানতে চাইলেন মেরিচাচী।

আবার নিজের দুই হাতের দিকে তাকালেন মিসেস অ্যান্ডারসন। হাত দুটো টেবিলের ওপর ফেলে রেখে মুখ তুললেন। 'না, কোন ধরনের অঘটন ওরা ঘটায়নি। কোন অপরাধ কিংবা অন্যায়ও করেনি। সমস্যাটা অন্য রকম।'

কিশোর, মুসা, রবিনের মুখের ওপর থেকে ঘুরে এল মিসেস অ্যান্ডারসনের দৃষ্টি। 'আবারও বলছি, কি ভাবে কথাটা শুরু করব আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু না বললেও চলছে না।'

সোয়েটারের আস্তিনে বেরিয়ে থাকা একটা সুতো টেনে ছেঁড়ার চেষ্টা করলেন মিস্টার ক্রেগ।

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলেন মিস্টার বেলসন। নড়েচড়ে বসলেন চেয়ারে।

'স্কুলের সবাইকে ঘাবড়ে দিচ্ছে কিশোর, মুসা ও রবিন,' অবশেষে কথাটা যেন ছুঁড়ে দিলেন মিসেস অ্যান্ডারসন। 'শুধু তাই না, টিচারদেরকেও ওরা ভয় পাইয়ে দিয়েছে।'

'কিন্তু, আমরা···' বলতে গেল কিশোর।

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন মিসেস অ্যান্ডারসন। তিন গোয়েন্দার অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'মহাবুদ্ধিমান হয়ে গেছে আপনাদের ছেলেগুলো। আগে কেন বুঝতে পারিনি সেটাও এক রহস্য। তবে গত হপ্তা দুয়েক ধরে যা ঘটছে, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই আমাদের।'

'মহাবুদ্ধিমান?' চোয়াল ডললেন রাশেদ পাশা। চোখ তুলে তাকালেন তিন গোয়েন্দার দিকে। 'মহা না হোক, তবে ওরা যে আর দশটা সাধারণ ছেলের চেয়ে বুদ্ধিমান সেটা আমরা অনেক আগে থেকেই জানি।'

'সেটা তো আমরাও জানতাম,' মিসেস অ্যান্ডারসন বললেন। 'কিন্তু গত কিছুদিন ধরে অদ্ভুত কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে ওরা। কিছুদিন এতটাই বোকা হয়ে রইল, যে ক্লাস পরীক্ষার সমস্ত টেস্টে ফেল করতে থাকল। আচার-আচরণে বোকামির চূড়ান্ত। কিন্তু গত দিন পনেরো ধরে হয়েছে উল্টোটা—বুদ্ধিমত্তার চূড়ান্ত।'

'কিন্তু বুদ্ধিমত্তার মধ্যে খারাপটা কি দেখলেন, তা তো বুঝতে পারছি না,' না বলে আর পারলেন না মুসার আম্মা মিসেস আমান।

'তা ঠিক,' মাথা ঝাঁকালেন মিসেস অ্যান্ডারসন। 'খারাপ কিছু নেই। প্রতিটি

পরীক্ষায় একশোতে একশো নাম্বার পায় ওরা। ক্লাসের যত বই আছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আগাগোড়া মুখস্থ। বইয়ের পর বই, বইয়ের পর বই পড়ে শেষ করে ফেলে ওরা, একটা অক্ষরও ভোলে না সেগুলোর। যে কোন বিষয়ের ওপর রচনা লিখতে দিলেও, যত কঠিন সাবজেক্টই হোক, বিশ-তিরিশ পৃষ্ঠার রচনা লিখে ফেলে অনায়াসে।'

'এটা তো দারুণ খবর!' হাসলেন মেরিচাচী। 'সাংঘাতিক! তারমানে গোয়েন্দাগিরির ভূত গেছে মাথা থেকে। আজকাল পড়াশোনার প্রতি বেশি মনোযোগী হয়েছে।'

'ঠিকই বলেছেন, এটা দারুণ খবরই,' মোলায়েম স্বরে মিসেস অ্যান্ডারসন বললেন। 'সাংঘাতিক। কিন্তু মোটেও ভাল অর্থে নয়। বুদ্ধি এত বেশি বেড়ে গেছে, ক্লাসে সারাক্ষণ টিচারদের ভুল শুধরে দিতে থাকে। পাঠ্যবইতে ভুল খুঁজে পায়। ওদের কাণ্ড-কারখানায় ওদেরকে রীতিমত ভয় পায় এখন সহপাঠীরা। তারা জানে, কোন প্রতিযোগিতাতেই আপনাদের ছেলেদের সঙ্গে পারবে না ওরা। ওদের ধারণা, অস্বাভাবিক···মানে, অলৌকিক কোন ব্যাপার ঘটছে কিশোর, মুসা আর রবিনকে ঘিরে।'

'না না, খারাপ কিছু ঘটাচ্ছে না ওরা,' মেরিচাচীকে কথা বলার জন্যে মুখ খুলতে দেখে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন মিস্টার ক্রেগ। ঝুঁকে এসেছেন সামনের দিকে। 'খুবই ভাল ছেলে ওরা। আসলে, যা করছে তার ওপর ওদের কোন হাত নেই। অনেক বেশি জানে ওরা। অনেক, অনেক বেশি। এই বয়েসের ছেলেদের তুলনায় সীমাহীন জ্ঞান ওদের, অস্বাভাবিক জ্ঞান। যেটা সত্যিই বিপজ্জনক, বুঝতেই পারছেন। স্কুলের পরিবেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে ওরা।'

'আমি লক্ষ করেছি,' মিস্টার বেলসন বললেন, 'ছেলেমেয়েরা এখন আর ওদের সঙ্গে খেলতে চায় না, কথা বলতে চায় না, দূরে দূরে থাকে, সব সময় এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করে। স্কুলের পরিবেশের জন্যে মোটেও সেটা ভাল কিছু নয়, বুঝতেই পারছেন।'

ঘরের সবগুলো চোখ এখন ওদের দিকে, দেখতে পাচ্ছে কিশোর। দুরুদুরু করছে বুকের মধ্যে। তার মনে হচ্ছে ঘটনাটা বাস্তবে ঘটছে না। যেন স্বপ্নের মধ্যে রয়েছে ওরা। অতিরিক্ত বুদ্ধিমান হয়ে যাওয়াটা যে এতখানি বিপজ্জনক কল্পনাই করতে পারেনি কোনদিন।

তারমানে আর সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেছে ওরা। আলাদা করে ফেলা হচ্ছে ওদেরকে। ভবিষ্যতে আরও কি ঘটতে পারে কল্পনা করে মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল শীতল শিহরণ।

তারমানে কোন ধরনের ফ্রিকে পরিণত হয়েছি আমি? মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করল সে।

আমার কোন বন্ধু থাকবে না। সবাই আমাকে ঘৃণা করবে।

টিচাররাও আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে, কারণ আমি ওদের ভুল ধরে দিই।

তাহলে কি ঘটবে আমার?

দুই সহকারীর দিকে তাকাল সে। মুসা আর রবিন—ওরাও আর তার সহকারী থাকতে চাইবে না। কারণ ওদের মগজও তার মত একই রকম বুদ্ধিমান হয়ে গেছে।

মাথা নিচু করে আছে মুসা।

নিজের নখ খুঁটছে রবিন।

দু'জনেই ভয় পেয়েছে। প্রচণ্ড ভয়।

'চুপ করে আছো কেন?' মিসেস অ্যান্ডারসন বললেন। 'কিছু বলো তোমরা।'

আচমকা বলে উঠল রবিন, 'কি বলব? এর কোন ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারব না!'

'একটা জিনিস হতে পারে…' বলতে গেল মুসা।

খপ করে তার হাত চেপে ধরল কিশোর, 'না না, মুসা, বোলো না! আঙ্কেল জ্যাককে আমরা কথা দিয়েছি কারও কাছে ফাঁস করব না।'

'কিন্তু না বললে দেখছ না কি রকম বিপদে পড়ে যাচ্ছি?' রবিন বলল। 'না বলে পারা যাবে না।'

'কি না বলে পারা যাবে না?' ধমকের সুরে বললেন রবিনের মা। 'আমার ভাই কি করেছে? বলো, জলদি! না বললে আমিই ওকে জিজ্ঞেস করছি।' ফোনের দিকে হাত বাড়ালেন তিনি।

'মগজ উন্নত করার ওষুধ খাইয়ে দিয়েছে আমাদেরকে,' বলে ফেলল রবিন।

'রবিন, থামো!' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

কিন্তু যা বলার বলে ফেলেছে রবিন। আর গোপন রাখা যাবে না। সুতরাং বাকিটাও বলে ফেলল রবিন, 'আমাদেরকে এক বোতল মগজ উন্নত করার ওষুধ দিয়েছিল আঙ্কেল জ্যাক। বুদ্ধি বাড়ানোর জন্যে। হঠাৎ করে কেন জানি বোকা হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। তার কাছে গিয়ে সব বললাম। বুদ্ধি বাড়ানোর ওষুধ নিয়ে গবেষণা করছে আঙ্কেল জ্যাক, আমাদের কাকুতি-মিনতি শুনে একটা বোতল দিয়ে দিয়েছিল, তিনজনে ভাগ করে খাওয়ার জন্যে। এবং তাতে কাজ হয়ে গেছে। ওষুধ আমাদের বুদ্ধি বাড়িয়ে দিয়েছে।'

'কিন্তু এত বোকাই বা হয়ে গিয়েছিলে কেন, হঠাৎ করে?' মেরিচাচী প্রশ্ন করলেন। টিচারদের দিকে তাকালেন। 'বোকা যে হয়ে গিয়েছিল, সেটা আমিও লক্ষ করেছি।'

মিস্টার আমান বললেন, 'আমিও।'

'তাহলেই তো বোঝা যাচ্ছে,' মিস্টার ক্রেগ বললেন, 'একটা পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল ওদের।'

'একটা নয়, দুটো,' দুই আঙুল তুললেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'একবার অতিরিক্ত বোকা হয়ে যাওয়া, একবার অতিরিক্ত বুদ্ধিমান।' কিশোরের দিকে তাকালেন তিনি। 'চালাকটা কি করে হলে, তা তো বুঝলাম। কিন্তু বোকা হলে কি করে?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'জানি না!'

চুপ হয়ে গেল সবাই।

ঘরে পিনপতন নীরবতা।

দীর্ঘক্ষণ পর জোরে নিঃশ্বাস ফেলে নীরবতা ভাঙলেন মিসেস অ্যান্ডারসন। 'কোন ধরনের জাদু-করা-ফরমুলা এ রকম বুদ্ধিমান বানিয়েছে তোমাদেরকে আমি জানি না,' তিন গোয়েন্দাকে বললেন তিনি। 'তবে একটা কথা জানি। এ স্কুল তোমাদেরকে ছাড়তে হবে। আর তোমাদেরকে এখানে রাখা সম্ভব হবে না আমাদের পক্ষে।'

ষোলো

আরও কিছুদিন পর।

কিশোরদের লিভিং রূমে বসে আছে তিন গোয়েন্দা। টিভি দেখছে।

'...এই তিনটে ছেলে স্কুল বোর্ডের সঙ্গে আইনী লড়াই লড়ছে এখন,' রিপোর্টার বলছে। 'প্রশ্ন উঠেছে, শিক্ষার জন্যে ওদের কি আর স্কুলে পড়ার দরকার আছে? স্কুল বলছে, নেই। ওদের অভিভাবকেরা বলছে, আছে। সুতরাং লড়াইটা চলছেই...'

পাশের ঘরে ফোনে কথা বলছেন মেরিচাচী। তাঁর এক বান্ধবীর সঙ্গে। 'না, আমাদের উকিল বলছে, জিতটা আমাদেরই হবে।...না না...নিশ্চয় নিশ্চয়...অন্য স্কুলের খোঁজেও রয়েছি আমরা। একটা প্রাইভেট স্কুলের সঙ্গে কথাও বলেছি। নিতে রাজি হয়েছে ওরা।...কি বললেন?...ও, আঙ্কেল জ্যাক। তিনি তো নেই এখন এখানে। সুইডেন চলে গেছেন একটা বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগ দিতে। তাঁর স্ত্রীও গেছেন সঙ্গে।...নাহ্, কোনভাবেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না।'

সামনের দরজার বেল বাজল।

খুলতে যাওয়ার জন্যে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েও বসে পড়ল কিশোর।

নিশ্চয় আরেকজন সাংবাদিক। একই প্রশ্ন করতে থাকবে। গত কয়েক দিনে কম করে হলেও ডজনখানেক সাক্ষাৎকার দিয়েছে ওরা।

আগে ভাবত রেডিও-টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দেয়াটা মজার ব্যাপার। কিন্তু এখন আর মজা নেই। লোকে যখন ওদেরকে ফ্রীক ভাবতে আরম্ভ করেছে। স্কুল থেকেও যখন বাড়িতে বসে থাকতে হচ্ছে, স্কুলে যেতে দেয়া হচ্ছে না ওদেরকে। তা ছাড়া কে দেখবে এখন ওদের অনুষ্ঠান? কেউ তো ওদের পছন্দ করে না।

ওই ওষুধ আমাদের জীবনটাকেই ধ্বংস করে দিয়েছে, ভেবে মনটা তেতো হয়ে গেল কিশোরের।

সোফা থেকে উঠে এসে দাঁড়াল দরজার কাছে। টেলিফোনে মেরিচাচী কি বলছেন ভাল করে শোনার জন্যে। এখন আর রবিনের আম্মার সঙ্গে নয়, একটা

টিভি কোম্পানিকে ধমকাচ্ছেন তিনি, 'না, কোনমতেই যাবে না। ওই মগজ উন্নত করার ওষুধে কোন আগ্রহ নেই আমাদের।...বুঝলাম আপনাদের কোম্পানি খুব ভাল ফলের রস বানায়, কিন্তু আমার ছেলে আপনাদের বিজ্ঞাপন করতে যাবে না। সরি।'

আস্তে করে সরে চলে এল কিশোর। আবার আগের জায়গায় এসে বসল। কানে আসছে মেরিচাচীর রাগত কণ্ঠ।

'কার সঙ্গে কথা বলছেন?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'টেলিভিশন। আমাদের দিয়ে বিজ্ঞাপন করাতে চাইছে,' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল কিশোর।

আগের দিনের কথা মনে পড়ল রবিনের। একটা লোক এসে বলল ওদের এজেন্ট হতে চায়। সাংঘাতিক এক পরিকল্পনা নিয়ে এসেছে সে। ওদেরকে ব্যবহার করে জুতো, ক্যান্ডি, সুগার কর্নের বিজ্ঞাপন করতে চায়। টেলিভিশনে শনিবার সকালের কমিক শো'তেও ওদের দিয়ে অভিনয় করাতে ইচ্ছুক। তাতে, তার ধারণা কোটি কোটি ডলার আয় হয়ে যাবে খুব সহজেই।

'ভালই তো,' রাজি হয়ে যাচ্ছিল মুসা। 'কোটিপতি হয়ে যাব আমরা। বিখ্যাত হয়ে যাব।'

'হুঁ, তা তো বটেই,' মুখ বাঁকিয়েছে কিশোর, 'বিখ্যাত ফ্রীক। অস্বাভাবিক মানুষ। সবাই আমাদেরকে আঙুল তুলে দেখাবে। আমাদের নিয়ে রসিকতা করবে। কোনদিন যদি স্বাভাবিক হইও আবার, মানুষ আর আমাদেরকে স্বাভাবিক ভাবে নেবে না।'

করুণ কণ্ঠে রবিন বলেছে, 'টাকা-পয়সা খ্যাতি কিছুই চাই না আমি। আমি শুধু স্বাভাবিক মানুষ হয়ে স্কুলে ফিরে যেতে চাই। সবার সঙ্গে স্বাভাবিক মানুষের মত মিশতে চাই।'

পরিবারের লোকজন চাইছে ওরা অপেক্ষা করুক। সাবধান থাকুক। হুট করে কোন কিছুতে সই করে না দিক। অন্তত স্কুলে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে আইনী লড়াইটার একটা কিনারা না হওয়া পর্যন্ত।

কিন্তু তাই বলে যে লোক আসা বন্ধ হচ্ছে তা না। নানা ধরনের লোক। খবরের কাগজ, বিজ্ঞাপন এজেন্ট, দোকানদার তো আছেই, প্রচুর ছেলেমেয়েরাও আসছে ওদের কাছে পড়ার জন্যে। আরেক দল আসছে ওদের পরামর্শ নিতে। কোন না কোন সমস্যায় পড়েছে ওরা। কি করলে সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে, সেটা জানতে।

তারপর, সেদিন বিকেলেরই ঘটনা। পেছনের আঙিনায় খেলছে কিশোর, রবিন আর মুসা। ওদের সঙ্গে ডন। এই সময় ড্রাইভওয়েতে ঢুকল একটা কালো রঙের ট্রাক। ফ্রিসবি খেলছিল ওরা। খেলা থামিয়ে ফিরে তাকাল। লম্বা, গাঢ় রঙের সুট পরা দু'জন লোককে সদর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে দেখল।

খেলা বাদ দিয়ে সেদিকে রওনা হলো ওরা। লোকগুলো কেন এসেছে দেখতে।

ততক্ষণে দরজা খুলে দিয়েছেন মেরিচাচী। ঘরে ঢুকেছে লোকগুলো।

'মিসেস পাশা,' একটা লোককে বলতে শুনল, 'আপনার স্বামীর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই আমরা। এখান থেকে যাব মিস্টার মিলফোর্ড আর মিস্টার আমানের বাড়িতে। একটা টেস্টের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।'

'টেস্ট?' বুঝতে পারলেন না মেরিচাচী। ভ্রূকুটি করলেন।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল লোকটা। 'ইউনিভার্সিটি রিসার্চ ল্যাব থেকে এসেছি আমরা। আপনাদের ছেলেদের আমরা ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যেতে চাই। ওদেরকে নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করব। এই যেমন ইনটেলিজেন্স টেস্ট। বেশ কিছু টেস্ট করব আমরা।'

ঘরে ঢুকেছে তিন গোয়েন্দা। ওদের দিকে ফিরে তাকাল অন্য লোকটা। 'আমরা দেখতে চাই কতখানি বুদ্ধিমান তোমরা। হয়তো সরকারের কাছেও তোমরা মূল্যবান হয়ে উঠবে। দেশের জন্যে নিশ্চয় কাজ করতে চাও তোমরা, চাও না?'

জবাব দিল না ওরা। নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল গম্ভীর চেহারার লোকটার দিকে।

'দেশের জন্যে কাজ তো সবাই করতে চায়,' ওদের হয়ে জবাব দিলেন মেরিচাচী।

'মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্যে ওদেরকে চাই আমরা,' প্রথম লোকটা বলল। 'প্রথমে ওদের লিখিত পরীক্ষা নেব আমরা। তারপর ডাক্তারদের সঙ্গে ওদের ইন্টারভিউ। এবং, তারপর অবশ্যই সার্জারি।'

'সার্জারি?' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মেরিচাচীর কণ্ঠ।

'হ্যাঁ। ওদের মগজ থেকে কিছু কোষের নমুনা নিতে চান ডাক্তাররা।'

সতেরো

আর শোনার অপেক্ষা করল না মুসা। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল ওরা। খোলা দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। ওর ভয়টা সংক্রমিত হলো রবিন আর কিশোরের মাঝেও।

দুড়দাড় করে সামনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে বেড়ার দিকে দৌড় দিল তিনজনে।

পেছন পেছন চিৎকার করতে করতে ছুটল ডন, 'আরে দাঁড়াও দাঁড়াও! মুসাভাই, তোমার ফ্রিসবিটা নেবে না?'

ফিরেও তাকাল না ওরা। ছুটতেই থাকল। পাতাবাহারের বেড়ার একটা ফোকরে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে মুচড়ে মুচড়ে বেরিয়ে চলে এল অন্যপাশে। থামল না। দৌড়াতেই থাকল।

পড়শীদের বাড়ি পেরোল। মোড় নিয়ে ছুটল আরেক দিকে। পেছনে জুতোর শব্দ। ডাকতে ডাকতে আসছে সেই দু'জন লোক। সামনে আরেকটা বাড়ি।

পাতাবাহারের পুরু বেড়ার ওপাশে ঘন ঝোপ। সোজা তার মধ্যে গিয়ে ডাইভ দিয়ে পড়ল মুসা। রবিন আর কিশোরও ঢুকল ওর পেছন পেছন।

কিন্তু এখানেও নিরাপদ নয় বুঝতে পেরে লাফিয়ে উঠে আবার দিল দৌড়। বাড়ির আঙিনা পার হয়ে বেরিয়ে এল একটা সরু গলিতে। ছুটল সেটা ধরে। মেইন রোডের দিকে।

মেইন রোডে ওঠার আগে আবার মোড় নিল। গোটা ছয়েক ব্লক পেরোনোর পর দম নেয়ার জন্যে থামল। ফোঁস ফোঁস করে হাঁপাচ্ছে। হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক। হাঁটুতে ভর দিয়ে বাঁকা হয়ে হাঁপাতে লাগল কিশোর। বসে পড়ল রবিন। মুসা কোমরে হাত দিয়ে হাঁপাচ্ছে।

'ব্যাটারা আসছে নাকি?' হাঁপানোর ফাঁকে কোনমতে বলল রবিন।

ফিরে তাকাল মুসা। 'না। দেখতে তো পাচ্ছি না।' সামনের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল পরিচিত একটা বাড়ি। 'আরে, রয়দের বাড়ির কাছে চলে এসেছি!'

কোন রকম দ্বিধা না করে বাড়িটার দিকে দৌড় দিল ওরা। একছুটে ঢুকে পড়ল পেছনের আঙিনায়। পেছনের একটা জানালায় এসে থাবা দিতে দিতে চিৎকার করে ডাকল মুসা, 'এই, বাড়ি আছো? রয়?'

কয়েক সেকেন্ড পর দরজা খুলে দিল রয়। তিন গোয়েন্দাকে দেখে চোখ বড় বড় হয়ে গেল। 'তোমরা?'

'হ্যাঁ, রয়,' হাঁপানো বন্ধ হচ্ছে না মুসার। না জিরালে আর হবে কি করে। 'ভেতরে আসতে পারি? তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছি আমরা।'

'অ্যাঁ!···হ্যাঁ, এসো না, এসো।' সরে ঢোকার জায়গা করে দিল রয়। রান্নাঘরে নিয়ে এলো কিশোরদেরকে। সেখানে শারিয়া আর ইমাকে বসে থাকতে দেখা গেল। টেবিলে বইখাতা ছড়ানো। তিন গোয়েন্দাকে দেখে ওরাও অবাক।

'দরজাটা লাগিয়ে দাও,' রয়কে অনুরোধ করল কিশোর।

'ঘটনাটা কি?' রয় জিজ্ঞেস করল।

শ্রাগ করল কিশোর। শার্টের বোতাম খুলে দিল। ঘেমে নেয়ে গেছে। কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে।

'আমরা পালিয়ে এসেছি,' কিশোর বলল। 'আর কোন উপায় না দেখে শেষে তোমাদের বাড়িটায় ঢুকে পড়েছি।'

টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল সে। বইখাতাগুলোর দিকে তাকাল। 'কি করছ? স্কুলের পড়া?'

একটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল শারিয়া। তারপর জবাব দিল, 'ইতিহাস পড়ছি। ভীষণ কঠিন। মনে হচ্ছে সারা সেমিস্টার ধরে পড়েও শেষ করতে পারব না।'

মুখ থেকে বের করে গোলাপী রঙের একটা বাবলগামের বেলুন বানাল ইমা। এক মুহূর্ত ঠোঁটে আটকে রেখে আবার ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলল। 'তোমরা কি স্কুলে ফেরত যাচ্ছ?'

'যেতে পারি,' কিশোর বলল। 'জানি না এখনও।'

আবার এক মুহূর্তের নীরবতা। কিশোরদেরকে তার বাড়িতে দেখে ভ্যাবাচ্যাকা

এগোতে যাবে, হঠাৎ পাশের একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল মাজুল আর গাজুল।

আঠারো

হাঁ করে তাকিয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। বুঝতে পারছে না এই দু'জন আবার কারা। অন্য কোন ব্রেন রিসার্চ ইনস্টিটিউটের লোক না তো? এরা আবার মগজের কোন অংশটা চায়?

পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে শুরু করল লোকগুলো। ভঙ্গিটা কেমন যান্ত্রিক। ধীরে ধীরে পা ফেলছে। একতালে। একসঙ্গে।

কিশোরের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ করে দিল ওকে। বলে দিতে লাগল, লোকগুলো বিপজ্জনক।

সামনে এসে দাঁড়াল গাজুল আর মাজুল।

'কে আপনারা?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'তোমাদের নতুন প্রভুর চর,' দু'জনের মধ্যে লম্বা লোকটা, গাজুল বলল।

'আমাদের মনিবের সেবা করার জন্যে নিয়ে যাব তোমাদেরকে,' মাজুল বলল। 'গোলাম বানাব তোমাদের।'

'গোলাম!' লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। কারা ওরা? এ প্রশ্নের জবাব তার অতি বুদ্ধিমান মগজও দিতে পারছে না। 'রসিকতা করছেন, তাই না?'

'আমরা রসিকতা করি না,' শীতল কণ্ঠে জবাব দিল গাজুল।

'অন্য কোন গ্রহ থেকে এসেছেন নাকি আপনারা?' মুসা জিজ্ঞেস করল ভয়ে ভয়ে। 'কণ্ঠস্বর অমন কেন? কেমন যান্ত্রিক। সিনেমায় দেখা রোবটগুলোর মত।'

'না, আমরা ভিনগ্রহবাসী নই, এই পৃথিবীরই মানুষ। তোমাদের কথাবার্তাই তো বরং আমাদের কাছে বিশ্রী লাগছে। কেমন আদিম আদিম। তোমাদের শোধরাতে সময় লাগবে। তবে শোধরাতে পারব। একবার আমাদের ঘাঁটিতে নিয়ে নিই। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।'

লোকগুলো রসিকতা করছে না, বুঝতে পারল কিশোর। পালানোর তাগিদ অনুভব করল।

আচমকা নড়ে উঠল সে। রবিনের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে চিৎকার করে বলল, 'মুসা, পালাও!'

তিনজন তিন দিকে দৌড় মারল ওরা। প্রাণপণে ছুটতে লাগল।

কিছুদূর এসে পেছনে পায়ের শব্দ না শুনে ফিরে তাকাল মুসা।

'কিশোর, ওরা আসছে না!'

ফিরে তাকাল কিশোর আর রবিন।

আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে লোকগুলো। চেহারাতেও তেমন কোন ভাবান্তর নেই। রাগ, হতাশা, ক্ষোভ, কোন কিছু নেই। নির্বিকার। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে ওরা যেন জানে কোনমতেই পালাতে পারবে না তিন গোয়েন্দা। ধরা পড়বেই।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত স্থির তাকিয়ে থেকে ঘুরে দাঁড়াল আবার কিশোর। হাঁটতে শুরু করল।

'কোথায় যাবে?' রবিনের প্রশ্ন।

'বাড়িতে।'

'কিন্তু লোকগুলো? রসিকতা করছিল?'

'না। আমাদেরকে ধরার নতুন কোন ফন্দি আঁটছে ওরা। বুঝতে পারছি না কি করবে!'

স্যালভিজ ইয়ার্ডের পেছনের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল ওরা।

সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল মেরিচাচীকে।

গাড়ির চাবি হাতে গ্যারেজের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন রাশেদ পাশা।

নেমে এলেন মেরিচাচী। কিশোরের সামনে দাঁড়ালেন। 'এত দেরি করলি কেন?'

'আবার দুটো লোক আমাদের ধরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল,' জবাব দিল কিশোর।

'কারা ওরা?'

'কি জানি! অদ্ভুত নাম, গাজুল আর মাজুল। বলল ওদের মনিবের জন্যে আমাদের নিয়ে যেতে চায় ওরা। গোলাম বানাবে।'

চট করে রাশেদ পাশার দিকে তাকালেন মেরিচাচী। 'কি কাণ্ডই না শুরু হলো। যন্ত্রণা! এর একটা বিহিত করা দরকার। পুলিশে ডায়ারি করাব নাকি? কি বলো?'

'দেখা যাক,' চিন্তিত ভঙ্গিতে গাল চুলকালেন রাশেদ পাশা। 'আগে স্কুলের সমস্যাটার একটা ফয়সালা করে আসি। কিশোর, তোরা ভেতরে যা। আমরা না আসা পর্যন্ত ঘর থেকে বেরোবি না। কাউকে ঢুকতে দিবি না। কারও সঙ্গে কথা বলবি না। যে-ই আসে আসুক।'

পেছনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল তিনজনে।

চকলেটের গন্ধ আসছে।

খিদেটা চাগিয়ে উঠল মুসার। 'নিশ্চয় কেক বানাচ্ছিলেন আন্টি। দেখো তো, কোথায় আছে?'

'এই যে, এখানে,' কাউন্টারের ওপাশ থেকে জবাব এল। মাথা তুলল ডন। একটা ট্রে বের করে কাউন্টারের ওপরে রাখল। তাতে ইয়া বড় এক কেক। এক টুকরো কেটে নিয়ে আয়েশ করে চিবাচ্ছে সে।

এত দৌড়াদৌড়ি ও এত পরিশ্রম গেছে যে, কিশোর আর রবিনেরও খিদে

লেগেছে। কেকটা দেখে আর সহ্য হলো না। দৌড়ে গেল তিনজনেই। ঝাঁপিয়ে পড়ল কেকের ওপর।

দেখতে দেখতে সাবাড় করে ফেলল অত বড় কেকটা।

রেফ্রিজারেটর থেকে কোকের বোতল বের করল কিশোর। তিনটে গ্লাসে ঢালল। রবিন আর মুসার হাতে একটা করে গ্লাস তুলে দিয়ে নিজে নিল তৃতীয়টা। ডনকে বলল, 'তুমি খেতে চাইলে ঢেলে নাও।'

রবিন বলল কিশোরকে, 'চলো, লিভিং রূমে গিয়ে বসি। সিনেমা-টিনেমা দেখে সময় কাটাই।'

কিন্তু লিভিং রূমে ঢুকেই থমকে দাঁড়াতে হলো ওদের। হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে গাজুল আর মাজুল।

মাজুলের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করল গাজুল।

মুহূর্তে ডনের পাশে চলে এল মাজুল। তার কলার চেপে ধরল। লাফ দিয়ে ডান হাতে বেরিয়ে এসেছে একটা পিস্তলের মত জিনিস। সেটা তুলে তাক করল একটা পাথরের ফ্লাওয়ার ভাসের দিকে। টিপে দিল ট্রিগার।

আগুনে পানি পড়লে ছ্যাঁৎ করে যেমন শব্দ হয়, তেমনি একটা শব্দ করে মুহূর্তে নেই হয়ে গেল জিনিসটা। একেবারে গায়েব।

হাঁ হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

'তাহলে বুঝলে তো,' হাসিমুখে বলল গাজুল, 'তোমাদেরও কি অবস্থা করতে পারি আমরা। কিন্তু করব না। কারণ গোলাম বানানোর জন্যে বহু কষ্টে তোমাদের খুঁজে বের করেছি আমরা। গোলাম হওয়ার উপযুক্ত বানিয়েছি। বোকা থেকে বুদ্ধিমান বানিয়েছি। এখন তোমরা আমাদের কাছে মূল্যবান। তবে তাই বলে ওই বাচ্চা ছেলেটাকেও কিছু করব না, তা ভেবো না। আমাদের কাছে ওর এক কানাকড়ি দাম নেই।'

পিস্তলটা ডনের মাথায় ঠেকিয়ে চাপ দিল মাজুল।

ব্যথা লাগল। চিৎকার করে উঠল ডন। লাথি মারল মাজুলের হাঁটুতে।

পা'টা সরিয়ে নিল মাজুল। ব্যথা পেল কিনা বোঝা গেল না। কারণ টুঁ শব্দও করল না সে। তবে পিস্তলের নলের মুখটা আরও ঠেসে ধরল ডনের মাথায়।

ব্যথায় ককাতে লাগল ডন।

পা বাড়াল মুসা।

'উঁহু,' আঙুল নেড়ে সাবধান করল গাজুল, 'কোন কিছু করার চেষ্টা করলে ও মারা যাবে,' ডনকে দেখাল সে। 'ও মরে যাবার পরও তোমাদেরকে ছাড়া হবে না। হয় আমাদের কথা মানবে, নয়তো মরবে।'

'কি করতে বলেন আমাদের?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কোন রকম ঝামেলা না করে আমাদের সঙ্গে চলো,' গাজুল বলল।

'কোথায়?'

'যেখানে আমি নিয়ে যাব।'

আরেকবার ডনের দিকে তাকাল কিশোর। মাজুলের হাতের পিস্তলটার দিকে

তাকাল। 'শুধু আমি গেলে হয় না?'

'না, তোমাদের তিনজনকেই যেতে হবে।'

রবিন বলল, 'ঝামেলা বাধিয়ে লাভ নেই, কিশোর। তুমি গেলে আমিও যাব। ডন বাঁচুক।'

'আমিও যাব,' দ্বিধা না করে বলল মুসা।

হাসি ফুটল গাজুলের মুখে। 'মানুষদের এ ধরনের আন্তরিকতাগুলো আমাকে অবাক করে। কেমন বোকার মত অন্যের জন্যে প্রাণ দিতে রাজি হয়ে যায়। যাকগে, আমার কি।' মাজুলের দিকে তাকাল সে। 'মাজুল, আমি ও-কে না বলা পর্যন্ত এখানে থাকো। ওকে আটকে রাখো। আমি ওদের নিয়ে যাচ্ছি। ও-কে বললে তুমিও চলে আসবে।'

'এটাকে কি করব?' ডনের কথা জিজ্ঞেস করল মাজুল।

'তোমার যা খুশি,' গাজুল বলল।

'তাহলে আমরা যাব না,' সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে বসল কিশোর। 'ওকে বাঁচানোর জন্যে আমরা যেতে রাজি হয়েছি। আমাদেরকে কথা দিতে হবে ডনের কোন ক্ষতি হবে না।'

এক মুহূর্ত ভাবল গাজুল। ঘাড় কাত করল। 'ঠিক আছে, কথা দিচ্ছি। ছেলেটার কোন ক্ষতি হবে না। এখন চলো।'

'আপনার কথার বিশ্বাস কি?'

'আমরা কথা দিলে কথা রাখি, এটাই আমাদের নিয়ম। সেজন্যে ভেবেচিন্তে কথা দিই। নাও, চলো তো এখন, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

উনিশ

বাইরের আঙিনায় একটা কালো কাঁচে ঢাকা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

কিশোর, মুসা আর রবিনকে এনে সেটাতে তুলল গাজুল। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল।

ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে গাড়ির গতি যতটা সম্ভব বাড়িয়ে দিল গাজুল। শহর থেকে বেরোতে সময় লাগল না। সোজা চলল বুনো অঞ্চলের দিকে।

বনের মধ্যে ঢুকল গাড়ি। আঁকাবাঁকা কাঁচা রাস্তা পার হয়ে এসে ঢুকল বনের মাঝখানের এক টুকরো খোলা জায়গায়।

গাড়ি থেকে তিন গোয়েন্দাকে নামতে বলল গাজুল।

অবাক হয়ে কিশোর দেখল, খোলা জায়গাটায় বিশাল একটা গোলকের মত জিনিস দাঁড়িয়ে আছে। আটটা পা। গায়ে নাম লেখা: টাইম ট্র্যাভেল-৭।

নামটা স্মৃতির পাতায় কোথায় যেন অনুরণন তুলল। চেনা চেনা মনে হচ্ছে তার, কিন্তু চিনতে পারছে না গোলকটাকে। কোথায় দেখেছে এ জিনিস? মনে করতে পারল না।

গোলকের কাছে তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে এল গাজুল। মোবাইল ফোনের মত একটা যন্ত্র বের করে কথা বলল। গুঞ্জন উঠল গোলকের ভেতরে। আট পায়ের মাঝখানে একটা গোল চাকতির মত ঢাকনা খুলে গিয়ে ঝুলে পড়ল ধীরে ধীরে। মই নেমে এল গোলকের পেটের ভেতর থেকে। সেটা বেয়ে উঠে যেতে আদেশ করল গাজুল।

উঠে গেল তিন গোয়েন্দা। জিনিসটাকে স্পেসশিপের মত লাগল ওদের কাছে। ভেতরে আলো এত উজ্জ্বল, চোখ মিটমিট করতে লাগল ওরা।

চারপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগল কিশোর। ছোট ছোট ডজনখানেক খুপরিমত চোখে পড়ল। এমন করে সাজানো, মৌচাকের মত দেখতে। মৌচাকের ভেতরে যেমন খুপরি করা থাকে।

গাজুলকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল তারই মত আরেকজন। ধাক্কা দিয়ে দিয়ে নিয়ে গিয়ে তিন গোয়েন্দাকে ঢোকাল একটা কিউবের মত দেখতে চারকোনা ঘরে। জেলখানার দরজার মত দরজাটা ঠেলে দিল। রূপালী রঙের শিকগুলো ঝলমল করছে। মৃদু আলোকিত টিউব লাইটের মত। তালা লাগানোর শব্দ কানে এল ওদের।

'এ তো দেখি খাঁচার মধ্যে এনে ভরেছে আমাদের,' মুসা বলল। 'জানোয়ারের খাঁচা।'

রূপালী রঙের একটা সরু গলি ধরে চলে গেল লোকগুলো। খাঁচার দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল গোয়েন্দারা। তীব্র আলো চোখে সইয়ে নেয়ার অপেক্ষা করছে। বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে হৃৎপিণ্ডটা।

'নিশ্চয় এখুনি উড়াল দেবে এই জিনিসটা,' রবিন বলল। 'আর কোনদিন আমরা আমাদের বাড়িঘর দেখতে পাব না। বাবা-মা, বন্ধু-বান্ধব কাউকে দেখব না।' শেষ দিকে ভারী হয়ে এল তার কণ্ঠস্বর।

বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে মুসা বলল, 'তবু যাই হোক, ডনকে তো বাঁচাতে পারলাম। কি বলো, কিশোর?'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল শুধু কিশোর।

'সত্যি কি বাঁচাতে পারলাম?' রবিনের প্রশ্ন। 'কি মনে হয় তোমার, কিশোর, মাজুল আর গাজুল কথা রাখবে?'

'শিওর হওয়ার তো কোন উপায় নেই। তবু ভালটাই আশা করি। ধরে নিলাম রাখবে।'

'তা তো বুঝলাম,' দুই হাতে শিক চেপে ধরল রবিন। 'কিন্তু আমাদের কি হবে এখন?'

'এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার একটা উপায় বের করতেই হবে আমাদের,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'একবার এটা উড়ে গেলে বাড়ি ফেরার পথ চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে যাবে আমাদের।'

চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল খাঁচাটার চারপাশে তাকাল সে। যে দরজাটা দিয়ে ঢুকেছে ওরা সেটা ছাড়া বেরোনোর আর কোন দরজা নেই। আছে কেবল খাঁচার

পর খাঁচা, ওপরে, নিচে, চারপাশে—মুরগীর খাঁচা একটার ওপর আরেকটা যেমন করে সাজিয়ে রাখা হয় সে-ভাবে।

দরজার শিকগুলোতে হাত বুলিয়ে দেখল কিশোর। এমন ভাবে মিশে রয়েছে, দেখাই যায় না কোথায় আছে। হাত বোলাতে বোলাতে বলে উঠল সে, 'দাঁড়াও দাঁড়াও, কোথায় আছে বুঝতে পারছি!'

দরজার শিক ধরে টান দিল সে। ঠেলা দিল। ঝাঁকি দিল। পাশে ঠেলে সরানোর চেষ্টা করল। প্রথমে ডানে, তারপর বাঁয়ে।

'নাহ্, নাড়াতেই পারছি না,' জোরে এক নিঃশ্বাস ফেলে বলল সে।

'তিনজনে মিলে ঠেললে কেমন হয়?' মুসা বলল।

'উঁহু, লাভ হবে না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'নিরেট ধাতু। কিছুই করতে পারব না। তার ওপর রয়েছে তালা। আর মজার ব্যাপারটা হলো, তালাটা দেখতেও পাচ্ছি না আমরা। কিন্তু জানি, আছে ওটা ওখানে। কোন হুড়কো-টুড়কোও দেখা যাচ্ছে না, দেখো।'

ভুরু কুঁচকে বলল রবিন, 'কিছুই করতে পারছি না। অথচ মজাটা দেখো, অতি বুদ্ধিমান হওয়ার কারণে স্কুল থেকেই বের করে দিল আমাদেরকে। বুদ্ধিমান হয়ে তাহলে লাভটা কি হলো?'

'লাভ হবে,' কিশোর বলল। 'ভাবতে থাকলে।'

'তাহলে ভাবছ না কেন?'

উজ্জ্বল শিকগুলোর ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকাল কিশোর। গাজুলকে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল। কখন কোনখান দিয়ে এসে উদয় হয়েছে বুঝতেও পারেনি গোয়েন্দারা। ঠিক তার পেছনে মাজুলকে উঁকি দিতে দেখল কিশোর।

গাজুল বলল, 'আমাদের কথা আমরা রেখেছি। ছেলেটাকে ছেড়ে দিয়ে এসেছে মাজুল। এখন আমরা রওনা হব। স্নায়ু শান্ত করো। আমাদের যদি শোনাতে না চাও জোরে কথা বলবে না। এতক্ষণ যা যা বলেছ, কন্ট্রোল প্যানেল থেকে সব শুনতে পেয়েছি আমরা।'

'আমাদের ছেড়ে দিন,' হাতজোড় করে অনুরোধ করল মুসা। 'দোহাই আপনাদের। আমরা গোলাম হতে পারব না।'

'হ্যাঁ, ঠিক,' তার সঙ্গে সুর মেলাল কিশোর। 'ভাল গোলাম আমরা কোনদিনই হতে পারব না। বেকার ধরে নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের। আপনাদের মনিব আমাদের পেয়ে মোটেও খুশি হবেন না। বরং প্রচণ্ড রেগে যাবেন। আপনারা জানেন না, আমাদের স্বভাব-চরিত্র একটুও ভাল না। কাজ করতে ইচ্ছে করে না আমাদের। কেউ আমাদের কথা শোনাতে পারে না। সব সময় খালি কুচিন্তা ঘোরে আমাদের মগজে। ক্ষতিকর চিন্তা। এ রকম শয়তান মানসিকতার কাউকে দিয়ে কি আর গোলামের কাজ করানো যায়?'

'কিন্তু আমরা করাব,' গাজুল বলল। 'গোলামদের কি ভাবে কাজ করাতে হয় জানা আছে আমাদের।'

মাজুলকে নিয়ে চলে গেল সে।

নিজেদের সম্পর্কে এত এত খারাপ কথা বলেও লাভ হলো না। গুঙিয়ে উঠল কিশোর।

শিক চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইল তিনজনে।

'আর কিছু করার নেই, কি বলো?' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল মুসা। 'কোনই লাভ হলো না। কিছুই করতে পারব না আমরা।'

'কিন্তু উপায় আছে কিনা ভাবতে দোষ কি?' রবিন বলল। 'অতি বুদ্ধিমান হয়ে গেছি আমরা। বুদ্ধি খরচ করে যদি নিজেদের বাঁচাতেই না পারলাম, তাহলে আর এ বুদ্ধি দিয়ে করবটা কি?'

স্থির দৃষ্টিতে রবিনের দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল কিশোর। 'ঠিক। কাজেই যদি না লাগল এত বুদ্ধি দিয়ে করবটা কি? এই বুদ্ধির জন্যেই যত যন্ত্রণা। আজ আমাদের এই দুরবস্থা। গোলাম বানানোর জন্যে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাদেরকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল তার দুই সহকারী।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরব হয়ে রইল তিনজনে। তাকিয়ে রইল ওদের সামনের রূপালী রঙের মৌচাকের মত খুপরিগুলোর দিকে।

তারপর ঘুরে তাকাল রবিন। বিড়বিড় করে বলল কিশোরকে, 'ভাবো। ভেবে বের করো না কিছু।'

'নাহ্,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে জবাব দিল কিশোর, 'কোন উপায় দেখছি না। কিছুই বের করতে পারছি না। কিচ্ছু না। তোমরা চেষ্টা করো না।'

'তুমি পারছ না আর আমরা পারব কোত্থেকে?' হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বলল মুসা।

'আমি এখন ভাবতেই পারছি না কিছু,' কিশোর বলল। 'মগজের ভেতরটা কেমন ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। স্পষ্ট হচ্ছে না কিছু। এই গোলকযানটাতে ঢোকার পর থেকেই ধীরে ধীরে ভারী হয়ে যাচ্ছে মাথাটা।'

কিশোরের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রবিন। কি বুঝল কে জানে। ঢোক গিলল। চোখ বড় বড় হয়ে গেল। চিৎকার করে উঠল হঠাৎ, 'আমারও হচ্ছে এ রকম! মগজের ওষুধ! নিশ্চয় কার্যকারিতা হারাচ্ছে! শেষ হয়ে যাচ্ছে ওষুধের ক্ষমতা!'

কাঁপতে শুরু করল খাঁচাটা। দুলতে শুরু করল। ঢেউয়ের মধ্যে পড়া নৌকার মত। পেছনে শোনা গেল ইঞ্জিনের জোরাল গর্জন। শক্ত করে শিক চেপে ধরল ওরা।

থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে পুরো গোলকটা।

'উড়াল দিচ্ছে এটা!' চিৎকার করে উঠল মুসা। 'উড়ে যাচ্ছে! এখন কি করব?'

বিশ

'ওখানে নেমে হয়তো ওদের বোকা বানাতে পারব,' কম্পিত কণ্ঠে বলল মুসা। 'হয়তো কথা বলতে পারব ওদের মনিবের সঙ্গে। বাড়ি পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করব। পাঠিয়ে দিতেও পারেন।'

'কি কারণটা আছে দেয়ার?' খাঁচার রূপালী শিকে কপাল ঠেকিয়ে বলল কিশোর, 'মোটেও বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে না আর নিজেকে। স্পষ্ট করে কিছুই ভাবতে পারছি না। কিছু বুঝতেও পারছি না।'

'বুঝতে তো আমিও পারছি না,' রবিন বলল। 'কেন এমন হচ্ছে? বেশি ভয় পাওয়ার জন্যে? গাজুল ঠিকই বলে গেছে—যদি শান্ত হতে পারি আমরা, স্নায়ুকে শান্ত করতে পারি, হয়তো…' কথা শেষ না করেই চুপ হয়ে গেল সে।

ওর দিকে তাকিয়ে থেকে মুসা বলল, 'আমাদেরকে অতি বুদ্ধিমান বানানোর চেষ্টা করেছিল ওরা। নামার পর যখন দেখবে আবার বোকা হয়ে গেছি আমরা, কি করবে তখন? মেরে ফেলবে? নাকি বাড়ি পাঠিয়ে দেবে?'

জবাব দেয়ার সময় পেল না রবিন কিংবা মুসা।

মাজুল এসে হাজির হয়েছে খাঁচার সামনে। গর্জে উঠে বলল, 'তোমাদের মিথ্যে কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে আমাদের। কি ভেবেছ তোমরা? মিথ্যে বলে আমাদের ফাঁকি দিতে পারবে? একটা কথা জেনে রাখো, মগজশক্তি রসায়নের কার্যকারিতা কখনও কমে না, মরার আগে কোনদিন কমবে না। অতএব ভাঁওতাবাজি বন্ধ করো।'

'কিন্তু, আপনি বুঝতে পারছেন না,' কিশোর বলল, 'আমাদের বেলায় কমেছে…'

'চুপ, গোলামের দল!' ধমকে উঠল মাজুল। 'আমাদের বোকা বানাতে পারবে না।' কতগুলো কাগজ খাঁচার ফাঁক দিয়ে ঠেলে দিল সে।

কাগজগুলো হাতে নিল কিশোর। বোকার মত তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'কি এগুলো?'

'দেখতে পাচ্ছ না? ধাঁধা,' মাজুল বলল। 'মগজকে ব্যস্ত রাখো। বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হবে।'

নিরাসক্ত ভঙ্গিতে কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। 'কি করে আপনার ধারণা হলো, এ সব ছাইপাঁশ আমাদের ভাল লাগবে?'

'ভাল লাগুক বা না লাগুক, তোমাদেরকে এগুলোর সমাধান করতেই হবে,' একঘেয়ে কণ্ঠে বলল মাজুল। 'মগজটাকে সাফ রাখতে হবে তোমাদের। ভোঁতা মগজ একদম পছন্দ করেন না আমাদের মনিব।'

'কিন্তু…কিন্তু আমরা তো…'

'ওসব বুঝিটুঝি না। করতেই হবে তোমাদেরকে।'

'মস্ত বড় একটা ভুল করছেন আপনারা,' রবিন বলল। 'অকারণে আমাদের টেনে না নিয়ে গিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে আসুন। আমাদেরকে দিয়ে কোন উপকার হবে না আপনাদের। কোন কাজ হবে না। গোলাম হওয়ার উপযুক্ত নই আমরা।'

জবাব দিল না মাজুল। ঘুরে রওনা হয়ে গেল। ফিরে গেল কন্ট্রোল ডেকে।

'ও···ও আমাদেরকে বিশ্বাস করল না,' গুঙিয়ে উঠল কিশোর। 'সত্যিই যে ওষুধের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বিশ্বাস করানো গেল না ওকে।'

'কি করব আমরা এখন?' কেঁদে ফেলবে যেন রবিন।

মাথায় হাত দিয়ে চুপচাপ বসে থাকল মুসা। কোন কথা বলল না।

প্রথম ক্রসওয়ার্ড পাজলটার দিকে তাকাল কিশোর। পড়ে শোনাল রবিন আর মুসাকে। বলল, 'চার অক্ষরের শব্দ, উল্টো দিকে যেতে হবে।'

চিবুক ডলল রবিন। 'হুঁম!' অনেকক্ষণ ধরে ভাবল। 'সূত্রটা কি বলো তো আবার। ভুলে গেছি।'

'ভুলে তো যাবেই, এত কঠিন। আমিও মাথামুণ্ড কিছু বুঝতে পারছি না। দূর বাদ দাও এটা। দেখি তো পরেরটা···'

গলা বাড়িয়ে দেখল রবিন। 'তিন অক্ষরের···এই, মুসা, দেখো না পারো নাকি।'

'পারব তো না-ই, আমার দেখতেও ইচ্ছে করছে না,' নিরাসক্ত গলায় বলে চোখ ফিরিয়ে আরেক দিকে তাকিয়ে রইল মুসা।

নীরব হয়ে গেল তিনজনে।

কিন্তু হাল ছাড়ল না কিশোর। কাগজটার দিকে তাকিয়ে থেকে বিড়বিড় করল, 'ডগ দিয়ে শুরু করলে কেমন হয়? ডগ মানে কুকুর।'

হাতের পেন্সিলটা নামিয়ে কাগজে 'ডগ' শব্দটা লিখতে গিয়ে থেমে গেল সে। 'কোনটাতে লিখব? সাদা ঘরটায় না কালো ঘরটায়?'

'মনে হয় সাদা ঘরটায়,' রবিন বলল। 'না না, কালো ঘরটায়। ধূর, বুঝতে পারছি না। এক কাজ করো। সাদাটাতেই লেখো।'

পেন্সিল নামাল আবার কিশোর। খসখস করে ঘষল কাগজে। 'আরি, লেখা বেরোচ্ছে না কেন?'

'বেরোবে কি করে? ধরেছই তো উল্টো করে,' রবিন বলল।

'আমি আগেই দেখেছি,' তিক্ত হাসি হেসে বলল মুসা। 'ইরেজারের দিকটা দিয়ে লেখা শুরু করেছে সে।'

'তাহলে বললে না কেন?' কিশোর বলল।

'ইচ্ছে করল না।'

চোখের পাতা সরু করে পেন্সিলের পেছনে লাগানো রবারটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। বিড়বিড় করে বলল, 'ইরেজার কি জিনিস?'

চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল রবিন। 'তাই তো! আমিও তো জানি না।'

কিশোরের হাত থেকে কাগজ আর পেন্সিল খসে পড়ে গেল। করুণ কণ্ঠে বলে উঠল, 'আবার বোকা হয়ে গেছি আমরা!... আগের চেয়ে হাঁদা!'

কেঁপে উঠল রবিন। কান্নার স্বরের মত ফোঁপানি বেরিয়ে এল গলা থেকে। 'কোন সন্দেহ নেই তাতে। ওষুধের ক্রিয়া শেষ হয়ে গেছে। মস্ত ক্ষতি করে দিয়ে গেছে আমাদের। এক্কেবারে বোকা বানিয়ে ফেলেছে।'

আতঙ্কিত হয়ে পড়ল কিশোর। জোরে জোরে মাথা নাড়তে শুরু করল। 'কি করব আমরা এখন? এতটাই বোকা হয়ে গেছি পালানোর কোন বুদ্ধিই আর কোনদিন বের করতে পারব না।'

ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করল রবিন।

তার কান্না দেখে মুসারও কান্না পেতে লাগল। মুখটাকে করুণ করে তুলে কিশোরকে জিজ্ঞেস করল, 'বেরোব কি ভাবে আমরা এখন? বুদ্ধি ঘোলা হয়ে গেছে। বাঁচার তো কোন উপায়ই আর বের করতে পারব না!'

একুশ

দেয়ালে হেলান দিয়ে ধাতব মেঝেতে বসে থাকল ওরা। চোখে শূন্য দৃষ্টি।

খাঁচার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল গাজুল আর মাজুল।

'পৌঁছে গেছি আমরা,' গাজুল জানাল।

এমন ভঙ্গিতে কিশোর, মুসা আর রবিন তিনজনেই মাথা ঝাঁকাতে লাগল যেন সদ্য ঘুম থেকে উঠেছে।

'কখন নামলাম?' মুসার প্রশ্ন। 'কোন শব্দ তো শুনলাম না। ঝাঁকুনি তো লাগল না।'

'কতক্ষণ লাগল আসতে?' রবিন অবাক। 'কখন রওনা হয়েছি, মনে করতে পারছি না।'

হাতঘড়ির দিকে তাকাল কিশোর। 'এ জিনিসটা দিয়ে সম্ভবত সময় মাপা যায়। কিন্তু কি ভাবে মাপতে হয়, ভুলে গেছি।'

খপ করে কিশোরের হাত চেপে ধরল রবিন। চোখের সামনে তুলে ধরে বলল, 'একটা বড় কাঁটা দেখা যাচ্ছে। আরেকটা ছোট কাঁটা। কোনটা দিয়ে কি হয়, বলো তো?'

'হেই, বাজে বোকো না!' ধমকে উঠল গাজুল। 'তোমাদের বকবকানি শোনার সময় আমাদের নেই। মনে করেছো তোমাদের চালাকি আমরা ধরতে পারিনি। খুব ভালমতই পেরেছি। আমরা জানি কতখানি বুদ্ধিমান তোমরা।'

খাঁচার একটা শিক চেপে ধরল গাজুল। তালা খোলার শব্দ হলো। এক ধরনের গুঞ্জন। তারপর পিছলে সরে গেল কয়েকটা শিক লাগানো একটা ফ্রেম। খুলে গেল দরজা।

জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে গাজুল আর মাজুল।

'আমি খুব উত্তেজিত বোধ করছি,' মাজুল বলল।

'আমিও করছি,' গাজুল বলল। 'আর উত্তেজিত হবই না বা কেন। এত চমৎকার তিনটে গোলাম নিয়ে এসেছি মনিবের জন্যে। তিনি ভীষণ খুশি হবেন।'

'উত্তেজিত আমরাও হচ্ছি,' কিশোর বলল। 'মনিব দেখব। কখনও তো দেখিনি। তা ভাই মনিব জিনিসটা কোন ধরনের জীব? শিং আছে? লেজ কয়টা?'

রবিন বলল, 'তাই তো! মনিব দেখব।' বাচ্চা মেয়ের মত হাততালি দিতে লাগল, 'কি মজা! কি মজা!' মুসার দিকে তাকাল। 'মুসা, তোমার আনন্দ লাগছে না?'

'না,' ভয়ে ভয়ে বলল মুসা। 'যদি কামড়ে দেয়?'

'চুপ! চুপ করো!' গর্জে উঠল গাজুল। 'বেরোও। এসো আমাদের সঙ্গে। আমাদের প্লেন ল্যান্ড করেছে মনিবের গম্বুজের ভেতরে। বেরোতে বেশি দেরি করলে মনিব ভীষণ রেগে যাবেন।'

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'গম্বুজের ভেতরে! বলেন কি! ঢুকল কি করে?'

'সে গেলেই দেখতে পাবে,' গর্বের সঙ্গে জবাব দিল গাজুল। পরক্ষণে বদলে গেল মুখের ভাব। ধমক দিয়ে বলল, 'খবরদার, বেশি কথা বলবে না। তোমাদের মনে রাখা উচিত, তোমরা গোলাম। কোন প্রশ্ন করবে না। কৌতূহল দেখাবে না। কথা বলতে যখন বলা হবে শুধু তখনই বলবে। মনে থাকবে?'

'নাহ্, থাকবে না,' জোরে নিঃশ্বাস ফেলে জবাব দিল কিশোর। 'কি জানি কি হয়ে গেছে আমাদের, কিছুই মনে থাকে না। যাকগে, মন নিয়ে অত চিন্তার কিছু নেই। তা আমাদের কাজটা কি? কি কি গোলামি করতে হবে?'

'মনিবের ব্যক্তিগত গোলাম হিসেবে তোমাদের কাজ হবে তাঁর ল্যাবরেটরিতে থাকা, সারাক্ষণ সহযোগিতা করা। যেহেতু তোমরা অতিবুদ্ধিমান গোলাম, তোমরা তাঁর সমস্ত অংক করে দেবে,' গাজুল বলল। 'কঠিন কঠিন সব ক্যালকুলেশন। অবশ্য সবই কম্পিউটারে। তোমরা...'

আতঙ্কে চোখ বড় বড় হয়ে গেল কিশোরের। 'কম্পিউটার! অংক! এগুলো আবার কি জিনিস?'

তাকে ধমক লাগাল রবিন, 'গাধা নাকি! অংক কি জিনিস বোঝো না? নম্বর, নম্বর। একগাদা নম্বর।'

'নম্বর না, সংখ্যার হিসেব,' অধৈর্য ভঙ্গিতে চিৎকার করে উঠল গাজুল।

'কিন্তু নম্বরের হিসেব তো আমরা কিছুই জানি না,' বোকার মত রবিন আর মুসার দিকে তাকাতে লাগল কিশোর। 'কি ভাবে কি করব, বলো তো? শেষে আমাদেরকে তাড়িয়ে দেবেন মনিব...'

'উঁহু, শিং দিয়ে গুঁতো মারবে,' শুধরে দিল তাকে মুসা। 'গাজুল-মাজুল যে ভাবে মনিবের নামে ভয় পাচ্ছে, আমার মনে হয় তার শিংগুলো খুব চোখা আর বড় বড়...'

'এই থামবে তোমরা!' চিৎকার করে বলল মাজুল। গাজুলের দিকে ফিরল। 'ঘটনাটা কি বলো তো ওদের? এমন করছে কেন?'

'ও কিছু না,' গাজুল জবাব দিল, 'ভয় পেয়েছে। ওদের কথায় কান দিও না। আমরা জানি ওরা কতখানি বুদ্ধিমান। চলো চলো, মনিবের সঙ্গে দেখাটা সেরে ফেলি।'

'হ্যাঁ, চলো।'

তিন গোয়েন্দার দিকে তাকাল গাজুল। 'কি হলো, হাঁ করে দেখছ কি? বেরোতে বললাম না? নাকি লেজারের শক দেয়া লাগবে।'

নির্বোধের মত প্রশ্ন করল কিশোর, 'সেটা আবার কি জিনিস? শিঙের চেয়ে খারাপ?'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মাজুল। 'নাহ, মনে হচ্ছে ধরে প্রথমে ক্লিনিং রুমে নিয়ে যেতে হবে এগুলোকে। লাল রক্তের ওপর আর আস্থা রাখতে পারছি না আমি।'

'তবে কি নীল রক্তও আছে?' বেফাঁস প্রশ্ন করে ফেলল যেন কিশোর।

'নীল নেই, তবে রূপালী রক্ত আছে। তোমাদের লাল রক্তের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাশালী, নষ্ট প্রায় হয়ই না, আর রাসায়নিক পদার্থ পরিবহনের ক্ষমতাও লাল রক্তের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। সত্যিই যদি তোমরা ভান না করে থাকো, তোমাদের বুদ্ধি কমে গিয়ে থাকে, লাল রক্ত সব ফেলে দিয়ে দেহে রূপালী রক্ত ভরলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। নাও, চলো এখন।'

গোলকযান থেকে ওদেরকে বের করে লম্বা একটা রূপালী হলওয়েতে নিয়ে এল গাজুল-মাজুল। ঘরের সব কিছুই যেন ক্রোম আর আয়নায় তৈরি। গোলকযানটার মতই এখানেও সব কিছু চকচকে, যেন রূপালী আগুনের আভায় জ্বলছে।

হাঁটার সময় পায়ের শব্দ জোরাল হয়ে কানে বাজে। দ্রুত হাঁটছে গাজুল আর মাজুল। ওদের সঙ্গে সমতা রাখার জন্যে রীতিমত দৌড়াতে হলো তিন গোয়েন্দাকে।

চকচকে একটা ডাবল ডোরের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। দাঁড়াতেই আপনাআপনি যেন পিছলে নিঃশব্দে খুলে গেল দরজার পাল্লা। গাজুল-মাজুলের পিছু পিছু রূপালী একটা বড় বাক্সের মধ্যে এসে ঢুকল গোয়েন্দারা।

'এই এলিভেটর আমাদেরকে ক্লিনিং রুমে নিয়ে যাবে,' গাজুল বলল। 'মনে রাখবে, তোমরা গোলাম। কারও সঙ্গে কথা বলবে না তোমরা।'

পেছনে নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ওপর দিকে ওটার টান অনুভব করল কিশোর। বুঝতে পারল ওপরে উঠছে এলিভেটর।

'এত বুদ্ধিমান তিনটে ছেলেকে গোলাম হিসেবে ধরে এনেছি দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না,' খুশি খুশি গলায় গাজুলকে বলল মাজুল। 'মনিব আমাদের ওপর খুব খুশি হবেন। সবাই হিংসে করবে আমাদের। তাই না?'

'তা করবে,' জবাব দিল গাজুল। 'ঝামেলা পাকানোর ওস্তাদ ওরা, বোঝা

যাচ্ছে, তবে গোলাম হিসেবে খারাপ হবে না।'

থামল এলিভেটর। দরজা খুলে গেল। পিঠে ধাক্কা গুঁতো মেরে নামতে আদেশ করা হলো তিন গোয়েন্দাকে। আরও বেশি উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত একটা হলওয়েতে নামল ওরা। কাঁচের মত চকচকে মসৃণ দেয়াল আর মেঝে থেকে আলোর আভা বেরোচ্ছে। আয়নার তৈরি ছাত। এত উজ্জ্বল, তাকানো যায় না সেদিকে। আপনা থেকেই চোখের পাতা বুজে আসে।

রবিনের শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল ভয়ের শীতল শিহরণ। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। হঠাৎ করেই ভাবনাটা চলে এল মাথায়, অন্য কোন গ্রহে নিয়ে আসা হয়নি তো ওদের? চারপাশের পরিবেশ তো বটেই, গাজুল-মাজুলের আচরণও সন্দেহজনক। ওদের কথাবার্তা ঠিক স্বাভাবিক মানুষের মত নয়। স্বাভাবিক মানুষের মত চিন্তা-ভাবনাও করে না ওরা। তারমানে অন্য কোন গ্রহেই ওদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে! কিডন্যাপ করা হয়েছে ওদেরকে। ভিনগ্রহবাসীদের রাজার গোলাম বানানোর জন্যে।

মুসা কিছু ভাবতে পারছে না। আতঙ্কে চিন্তাশক্তিই যেন ভোঁতা হয়ে গেছে ওর।

আর লম্বা, চকচকে হলওয়ে ধরে হাঁটার সময় কিশোরের মনে হচ্ছে, বাস্তবে নেই ওরা, স্বপ্নের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু সে জানে, এটা বাস্তব। মুসা আর রবিনের চেয়ে কম ভয় পাচ্ছে না সে।

হল পার হয়ে এসে মস্ত একটা ছড়ানো জায়গা। চারকোনা বাক্সের মত অসংখ্য ছোট ছোট ঘর। কাঁচের বাক্সের মত। তার ভেতরে গাজুল-মাজুলের মত ছোট ছোট মানুষেরা শুয়ে আছে। যেন মানুষ বানানোর কারখানা এটা।

চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে দেখছে তিন গোয়েন্দা। হাঁ হয়ে ঝুলে পড়েছে মুসার নিচের চোয়াল। বাক্সগুলোর উল্টো দিকের মস্ত দেয়ালের একটা দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল। বেরিয়ে এল একজন মানুষ। যান্ত্রিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'এই রোবটগুলোকে আনলে কোত্থেকে? এদের জন্ম তো এখানে হয়েছে বলে মনে হয় না।'

'না, এরা রোবট নয়, মানুষ,' জবাব দিল গাজুল।

'অ!' বিড়বিড় করল লোকটা।

'কিন্তু মানুষ আনতে গেলে কেন?' জিজ্ঞেস করল আরেকটা লোক। 'জ্বালাবে তো। জ্বালিয়ে মারবে।'

'জ্বালানোর কারণটা বন্ধ করে নিলেই হবে,' গাজুল বলল। 'তখন গোলাম হিসেবে এদের তুলনা হবে না। তাড়াতাড়ি করা দরকার। অপেক্ষা করতে করতে মনিব শেষে খেপে যাবেন।'

আরেকটা ওরকম বাক্সওয়ালা ঘর পেরিয়ে এল ওরা। এটার মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত বোঝাই কাঁচের বাক্স। সবগুলো মানবশিশুতে ভর্তি। যেন ইনকিউবেটরে রাখা ডিম ফুটে মুরগীর বাচ্চা বেরোনোর মত করে জন্ম দেয়া হয়েছে এই শিশুদের।

দূর থেকে অদ্ভুত বাজনার শব্দ ভেসে এল। বৈদ্যুতিক করাত দিয়ে কাঠ চেরাই করার সঙ্গে মৌমাছির গুঞ্জন মিশিয়ে দিলে যে রকম শুনতে লাগবে, শব্দটা অনেকটা সেই রকম। একঘেয়ে। শুনতে শুনতে কেমন যেন ঝিম ধরে আসে।

'এই যে এটাই,' একটা বিশাল ঘর দেখিয়ে বলল গাজুল। 'এসে গেছি ক্লিনিং রুমের কাছে। এখানেই তোমাদেরকে ধোলাই করা হবে। ডানে ঘোরো।'

থেমে গেল কিশোর। ডানে-বাঁয়ে তাকাতে লাগল। 'ডানদিকটা কোন দিকে? বুঝতে পারছি না তো। ডান কোনদিকে হয়?'

'তাই তো!' হাবার মত চারপাশে তাকাতে লাগল মুসা। 'ডান কোনটা?'

হাত তুলে দু'দিকে দেখিয়ে মুসাকে বোঝাতে চাইল রবিন, 'একবার এদিকে ডান। একবার এদিকে ডান। চতুর্দিকই ডান দিক। কিন্তু কোনদিকে যাব কিভাবে মনে রাখব? কোনদিকে যাচ্ছি, সেটা মনে রাখা তো আরও কঠিন।'

'থামো!' চিৎকার করে উঠল গাজুল। 'এ সব বদমাশি বন্ধ করো! বোকামির ভান করে এখনও ফাঁকি দেবার চেষ্টা। ভেবেছ আমি কিছু বুঝতে পারছি না, না? এসো, এদিক দিয়ে এসো।'

বড়, উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত একটা ঘরে ওদেরকে ঠেলে দিল সে। বড় বড় রূপালী রঙের ধাতব টেবিল সাজানো রয়েছে ঘরটাতে। দেয়াল ঘেঁষে বসানো অদ্ভুত সব ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করছে টেকনিশিয়ানরা।

দেয়ালের সাইজ দেখে মনে হয় মাইলখানেক লম্বা। আয়না বসানো ছাতের কাছাকাছি বেরিয়ে থাকা ঝোলা বারান্দার মত দেখতে ক্যাটওয়াকে চলাফেরা করছে টেকনিশয়ানরা। ওখানেও যন্ত্রপাতি বসানো। নানা ধরনের শব্দ বেরোচ্ছে ওগুলো থেকে। তবে কোনটাই তেমন উচ্চকিত কিংবা জোরাল নয়। কানে পীড়া দেয় না।

তার নিজের চেয়ে লম্বা আরেকজন লোককে হাতের ইশারায় ডাক দিল গাজুল। লোকটা কাছে এলে বিজাতীয় ভাষায় তাকে কি যেন বলতে লাগল সে। এক বর্ণও বুঝতে পারল না তিন গোয়েন্দা।

কথা শেষ হলে ওদের দিকে ফিরে তাকাল সে। 'নতুন গোলামদের দেখার জন্যে অপেক্ষা করে আছেন মনিব। প্রথমে তোমাদের ভেতরের যন্ত্রপাতি সব ধোলাই করে সাফ করা হবে। তবে প্রথমেই সেটা করতে গেলে মারা যেতে পারো তোমরা, তাই দেহের সমস্ত লাল রক্ত বের করে ফেলে রূপালী রক্ত ভরতে হবে আগে, আমাদের মত। রূপালী রক্ত ভীষণ টেকসই। যত ধোলাইই করা হোক না কেন, মরবে না তখন আর। বুদ্ধিতেও কোন রকম গোলমাল যদি থেকে থাকে, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আবার লম্বা লোকটার দিকে ফিরে তাকিয়ে কি যেন বলল গাজুল।

দেয়ালের দিকে ফিরে তিনজন লোককে ডেকে কথা বলল লম্বা লোকটা। অদ্ভুত সেই ভাষার এক বর্ণও বুঝতে পারল না তিন গোয়েন্দা। গাট্টাগোট্টা তিনজন লোক এগিয়ে এল। হাতে তিনটে কিম্ভূত যন্ত্র। প্রতিটি যন্ত্র থেকে একটা করে মোটা নল বেরিয়ে আছে। নলের মাথায় চোখা সুচের মত জিনিস। সেগুলো

গোয়েন্দাদের দিকে বাড়িয়ে দিল ওরা।

'কি-কি-কি করছেন আপনারা!' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

'ভয় নেই, ডান হাতটা বাড়াও তো,' গাজুল বলল। 'একটুও ব্যথা পাবে না। সুচের মাথায় ব্যথানিরোধক লাগানো আছে। এক দিক দিয়ে তোমাদের লাল রক্ত বেরোতে থাকবে, আরেক দিক দিয়ে রূপালী রক্ত ঢুকবে। দেখবে, দুনিয়াটাই পাল্টে গেছে তখন। খুব আরাম পাবে। নাও, হাতটা বাড়াও। তাড়াতাড়ি করো। মনিব অপেক্ষা করছেন।'

মুসা আর রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। ওদের চোখেও আতঙ্ক।

কিশোর বলল, 'তারমানে···তারমানে আপনাদের দেহেও রূপালী রক্ত?'

হেসে মাথা ঝাঁকাল গাজুল। 'হ্যাঁ। আমাদের দেহে আর যন্ত্রপাতিতে আরও কিছু পরিবর্তন আছে, যেগুলো তোমাদের নেই। আমাদের মগজটাও অন্য রকম, তোমাদের মত না।'

'কোনও ধরনের রোবট না তো?' কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল রবিনের।

মাথা ঝাঁকাল গাজুল, 'তা বলতে পারো। রোবটমানব। তবে রোবট হয়ে অসুবিধে নেই। মানুষ হওয়ার চেয়ে রোবট হওয়া অনেক শান্তির। কথা অনেক হলো। নাও, দেখি, ডান হাতটা বাড়াও তো এখন। আধঘণ্টার মধ্যেই দুঃখ-কষ্ট, বাড়ির জন্যে মন কেমন করা—কোন কিছুই থাকবে না আর তোমাদের।'

বাইশ

কিশোরের হাতটা ধরার জন্যে হাত বাড়াল একজন রোবটমানব।

চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'না না!'

ততক্ষণে রবিনের হাত চেপে ধরেছে একটা রোবট।

কিন্তু মুসাকে ধরতে যেতেই আচমকা ঘুরে দৌড় মারল সে। চিৎকার করে বলতে লাগল, 'কিশোর, রবিন, পালাও!'

রূপালী টেবিলগুলোর ফাঁক-ফোকর দিয়ে ছুটতে থাকল ওরা। প্রথমে কিছু বুঝতে পারল না কর্মরত রোবটরা। তারপর গাজুলের চিৎকারে তাড়া করে এল কয়েকজন।

ফিরে তাকাল কিশোর। গাজুল-মাজুল সহ আরও সাত-আটটা রোবট ওদের পিছু নিয়েছে।

প্রাণপণে ছুটতে লাগল তিন গোয়েন্দা। বেরিয়ে এল আরেকটা আয়না বসানো চকচকে হলরুমে। এত উজ্জ্বল, এত তীব্র আলো, চোখ মেলে রাখাই কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

'কোথায় যাচ্ছি?' চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'জানি না!' জবাব দিল কিশোর। 'কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, কোথায় যাচ্ছি কি করে বলব?'

অন্ধের মত হোঁচট খেয়ে পড়ল সামনের দিকে। দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে চিৎকার বেরিয়ে এল আপনাআপনি।

সাঁড়াশির মত কঠিন আঙুল চেপে ধরল ওকে পেছন থেকে।

ছাড়া পাওয়ার জন্যে চিৎকার-চেঁচামেচি, ধস্তাধস্তি শুরু করল সে।

কিন্তু ধরা পড়ে গেছে। রবিন আর মুসাও ছাড়া পাওয়ার জন্যে চিৎকার করছে। হাত-পা ছুঁড়ছে। লাভ নেই। রোবটমানবেরা ওদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।

কাছে এসে দাঁড়াল গাজুল-মাজুল।

গম্ভীর কণ্ঠে গাজুল বলল, 'অকারণ চেষ্টা, গোলামেরা। এখান থেকে পালিয়ে বাঁচতে আর পারবে না তোমরা কোনমতেই।'

'বাড়ি যাওয়া আর হবে না তোমাদের কোনদিন,' হাসতে হাসতে বলল মাজুল। 'আর যদি হয়ও, লাল রক্ত নিয়ে যেতে পারবে না। রূপালী রক্ত নিয়ে যেতে হবে। তা-ও কোনও অপারেশনে, যদি মনিব মনে করেন তোমাদেরকে পাঠানো দরকার।'

দরজার দিকে ফিরে তাকাল গাজুল। যন্ত্রহাতে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে সেই তিনজন রক্তবদলকারী টেকনিশিয়ান। হাত নেড়ে তাদেরকে ডেকে বলল গাজুল, 'এসো। বদলে দাও।'

তিন গোয়েন্দাকে যারা ধরেছে তাদের উদ্দেশে বলল সে, 'শক্ত করে ধরে রাখো। ছাড়বে না।'

দরজায় দাঁড়ানো একজন টেকনিশিয়ান বলল, 'এখানে না বদলে ক্লিনিং রূমেই নিয়ে এসো না। রক্ত বদলানোর পর তো ধোলাই করার জন্যে সেখানে নিতেই হবে।'

কি যেন ভাবল গাজুল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, নিয়ে চলো।'

আবার ক্লিনিং রূমে নিয়ে আসা হলো তিন গোয়েন্দাকে। রূপালী টেবিলে তোলা হলো। চিত করে শুইয়ে দিয়ে হাত-পা চেপে ধরা হলো।

যন্ত্রের সুইচ টিপে দিতে লাগল টেকনিশিয়ানরা। মৃদু গুঞ্জন তুলে চালু হয়ে গেল মেশিন। সবার চোখ এখন এদিকে। ক্যাটওয়াকে যারা কাজ করছিল, কাজ থামিয়ে দিয়ে তারাও তাকিয়ে আছে।

'আর···আর বোধহয় বাঁচতে পারলাম না,' গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'গাজুল ঠিকই বলেছে। আমরা শেষ।'

ফুঁপিয়ে উঠল রবিন। কান্নার মত স্বর বেরোল গলা থেকে।

কিশোর তাকিয়ে আছে তার পাশে দাঁড়ানো রোবটমানবের হাতের যন্ত্রটার দিকে। সুচের মত জিনিসটা তার ডান হাতের ওপর নিয়ে এসেছে রোবট। হাতের শিরা খুঁজছে ফুটিয়ে দেয়ার জন্যে।

চামড়া স্পর্শ করল সুচ।

তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা।

শিরার মধ্যে বিঁধে গেল সুচ।

শীতল আতঙ্ক যেন গ্রাস করল কিশোরকে। অবশ হয়ে এল হাত-পা। মাথার মধ্যে অদ্ভুত এক অনুভূতি। মুক্তির আর কোন উপায় নেই। কিছুই করার নেই আর। হাল ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজল।

ঠিক এই সময় ক্যাটওয়াকের কাছ থেকে গমগম করে উঠল একটা ভারী কণ্ঠ, 'কোথায়? কই? কাদের নিয়ে আসা হয়েছে?'

কণ্ঠটা কেমন চেনা চেনা লাগল কিশোরের।

চোখ মেলল আবার।

ক্যাটওয়াকের দিকে তাকিয়ে কণ্ঠের মালিককে দেখেই স্থির হয়ে গেল। বুঝতে পারল কেন চেনা চেনা লাগছিল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

ক্যাটওয়াকে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং ডক্টর মুন! মহাক্ষমতাধর অসাধারণ ক্ষমতাশালী সেই বিজ্ঞানী, যাঁর সঙ্গে বহুবার মোলাকাত হয়েছে ওদের।

ডক্টর মুনকে দেখে নিশ্চিত হলো রবিন, ভিনগ্রহে নয়, পৃথিবীতেই রয়েছে ওরা, ডক্টর মুনের কোনও গোপন আস্তানায়।

তিন গোয়েন্দাকেও দেখতে পেলেন ডক্টর মুন। বিমল হাসি ফুটল তাঁর মুখে। আদেশ দিলেন, 'অ্যাই ছাড়ো। ছেড়ে দাও ওদের।'

বিনীত ভঙ্গিতে গাজুল বলল, 'রক্ত বদলানো এখনও শেষ হয়নি, মালিক।'

'না হোক,' আদেশ দিলেন ডক্টর মুন। 'নিয়ে এসো ওদেরকে আমার চেম্বারে।'

রবিনের দিকে ফিরে তাকিয়ে ফিসফিস করে মুসা বলল, 'মনে হচ্ছে বেঁচে গেলাম এ যাত্রা।'

'কি জানি!' জবাব দিল রবিন। 'কিংবা হয়তো আরও বড় কোন বিপদে পড়তে যাচ্ছি। ডক্টর মুনকে আমরা যে পরিমাণ ভুগিয়েছি এতকাল, এবার নিশ্চয় প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বেন না।'

সাদা আলো জ্বলছে ডক্টর মুনের চেম্বারে। তবে ক্লিনিং রুমের মত এত উজ্জ্বল চোখ ধাঁধানো নয়, চোখে পীড়াদায়কও নয়।

ঘুরে গিয়ে মস্ত ডেস্কের ওপাশে বসলেন ডক্টর মুন। তাঁর দুই পাশে গিয়ে দাঁড়াল দু'জন বডিগার্ড। ওরা স্বাভাবিক লাল রক্তের মানুষ নাকি রোবটমানব, দেখে বোঝার উপায় নেই। গম্ভীর, ভাবলেশহীন চেহারা।

তিন গোয়েন্দাকে ধরে নিয়ে ঘরে ঢুকেছে তিনজন প্রহরী। তাদের সঙ্গে গাজুল-মাজুল।

ডেস্কের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো গোয়েন্দাদেরকে। হাসিমুখে তাদের দুই পাশে এসে দাঁড়াল গাজুল-মাজুল।

'আপনার জন্যে নতুন গোলাম নিয়ে এলাম, মালিক,' মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করে

বলল গাজুল।

'ভীষণ বুদ্ধিমান ওরা,' যোগ করল মাজুল।

ভুরু কুঁচকে তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে রইলেন ডক্টর মুন। 'কিন্তু ওরা বুদ্ধিমান হয় কি করে? ওদেরকে তো বোকা বানিয়ে দিয়েছিলাম আমি।'

বুঝতে পারল না গাজুল। 'বোকা বানিয়ে দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ,' ডক্টর মুন বললেন। 'আমাদের একটা টাইম ট্র্যাভেল মেশিন নিয়ে পালিয়েছিল ওরা। নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল লেকের পানিতে। ওটাতে চড়েই কিছুদিন আগে ফিরে এসেছিল আবার।'

'তারপর?' কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল গাজুল।

'মগজের মান নামানোর ওষুধ দিয়ে দিলাম বোকা বানিয়ে। ফেরত পাঠিয়ে দিলাম বাড়িতে। ওরা আমার পুরানো শত্রু। আমার কাজে বার বার বাগড়া দিয়েছে। বহু ক্ষতি করেছে। মেরে ফেলা যেত, কিন্তু তার কোন প্রয়োজন মনে করলাম না। এমন একটা কিছু করে দিতে চাইলাম, যাতে আমার কোন ক্ষতি করতে না পারে আর কোনদিন। ভাবলাম, কি করলে সেটা সম্ভব? বোকা বানিয়ে দিলে। বুদ্ধি না থাকলে আমার বিরুদ্ধে লাগতে পারবে না আর কখনও।'

হাসিমুখে গাজুল জানাল, 'শাস্তি ওদের ভালমতই হয়েছে, মালিক। স্কুলে টিচার, বন্ধু-বান্ধবরা সারাক্ষণ ওদের নিয়ে দূর-দূর ছ্যা-ছ্যা করেছে, ইয়ার্কি মেরেছে, হাসাহাসি করেছে। তবে ইদানীং সেই অবস্থাটা আর ছিল না। তবে ওদের ভয় পাওয়া শুরু করেছিল পরিচিতজনেরা। ফ্রীক ভাবতে আরম্ভ করেছিল।'

'তার মানে?'

'মগজশক্তি রসায়ন দিয়ে বুদ্ধিমান বানিয়ে ফেলেছি। এত বেশি বুদ্ধিমান হয়ে গেছে ওরা এখন, ওদের বুদ্ধিমত্তার যন্ত্রণায় টিকতে না পেরে স্কুল থেকেই বের করে দিয়েছে ওদেরকে টিচাররা। বন্ধু-বান্ধবরা ভয়ে মিশতে চায় না। খুব ভাল গোলাম হবে আপনার, মালিক।'

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন ডক্টর মুন। 'ভুল করেছ। মস্ত ভুল। স্বাভাবিক বুদ্ধি যখন ছিল এদের, তখনই এরা আমার ক্ষতি করেছে একের পর এক। আগের চেয়েও বুদ্ধি যদি বেড়ে গিয়ে থাকে তাহলে তো দানবে পরিণত হয়েছে এখন। এদের এত বুদ্ধিমান রাখা যাবে না কোনমতেই। আমার ল্যাবরেটরিই ধ্বংস করে দিয়ে বেরিয়ে যাবে কোনদিন। তবে ওষুধ খাইয়ে যখন ফেলেছই, দেখা যাক কি রকম বুদ্ধিমান ওরা হয়েছে, তারপর আবার বোকা বানিয়ে দিলেই হবে। আর স্মৃতিশক্তিটাও ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে।...কিশোর পাশা, বলো তো আমি কে?'

'আপনি আমাদের মালিক,' নির্বিকার ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর।

'মুসা, রবিন, তোমরা বলো তো আমি কে?'

'আপনি গাজুল-মাজুল-হাজুল-বাজুল সবার মালিক,' জবাব দিল মুসা।

রবিন বলল, 'আপনি রোবটমানব টাকরাভুম ওরফে গাকরা মিয়া।'

রাগ ঝিলিক দিয়ে উঠল ডক্টর মুনের চোখে। কোনমতে দমন করলেন। ঝট

করে তাকালেন একবার গাজুল-মাজুলের দিকে। কুঁকড়ে গেল ওরা।

গাজুল বলল, 'ওরা বোকা সাজার ভান করছে।' কিন্তু গলায় জোর নেই তার।

মাজুল বলল, 'মালিক, ওদের অংক দিয়ে দেখুন। মুহূর্তে করে ফেলবে। যত কঠিনই দেন না কেন।'

আবার কিশোরের দিকে তাকালেন ডক্টর মুন। দুই আঙুল তুলল। 'বলো তো এখানে ক'টা আঙুল?'

নির্দ্বিধায় জবাব দিল কিশোর, 'সাড়ে দশটা।'

মুসাকে জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর মুন, 'তুমি বলো, দুই আর তিন যোগ করলে কত হয়।'

'বিশ।'

'হাঁদারাম!' ধমকে উঠল রবিন। 'দুই আর তিন যোগ করলে বিশ হয় নাকি? একুশ হয়, একুশ একুশ।'

'আরে কি শুরু করলে কি তোমরা?' কিশোর বলল। 'আমরা যে বুদ্ধিমান হয়ে গেছি, এটা বুঝিয়ে দিতে চাও নাকি? তাহলে তো ধরে গোলাম বানাবে।'

তাড়াতাড়ি জিভ কাটল রবিন, 'না না, তা কেন বোঝাব। এই মুসা, দুইয়ে আর তিনে এগারো হয়, বুঝলে? বারো বললেও অবশ্য ভুল হবে না।'

হা-হা করে হাসল কিশোর। 'গাধাটা কি বলেরে!'

'গাধা! গাধা!' করে সমানে চেঁচাতে লাগল মুসা আর রবিন। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাবার মত হি-হি করে হাসতে লাগল।

'যথেষ্ট হয়েছে!' চিৎকার করে উঠলেন ডক্টর মুন। 'থামো!'

রাগত চোখে গাজুলের দিকে তাকালেন আবার তিনি। ঘামতে আরম্ভ করেছে গাজুল।

কর্কশ কণ্ঠে ডক্টর মুন বললেন, 'কি, কোথায় বুদ্ধিমান? আগের চেয়ে তো হাঁদা হয়েছে আরও। এত বোকা তো আমিও বানাইনি। বললাম না মগজশক্তি রসায়ন লাল রক্তে কাজ করে না।'

হাত কচলে গাজুল বলল, 'কিন্তু মালিক, আমি সত্যি বলছি, বুদ্ধিমত্তার জন্যে ওদেরকে স্কুল থেকে বের করে দেয়া হয়েছে।'

'তাহলে বোকা হলো কি করে?' ভুরু নাচালেন ডক্টর মুন।

ধীরে ধীরে পেছনে সরে যেতে লাগল মাজুল।

ধমকে উঠলেন ডক্টর মুন, 'যাচ্ছ কোথায়?'

পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে গেল মাজুল।

কঠিন কণ্ঠে গাজুল-মাজুলের উদ্দেশে বললেন ডক্টর মুন, 'নিশ্চয় রিঅ্যাকশন হয়েছে ওষুধে। আমি নিশ্চিত, লাল রক্তে কাজ করে না এই ওষুধ। আর করলেও বেশিদিন কার্যকর থাকে না।' গর্জে উঠলেন হঠাৎ, 'তোমাদের পাঠানো হয়েছে স্বাভাবিক মগজের বুদ্ধিমান মানুষকে ধরে আনতে। এ কাকে নিয়ে এলে তোমরা? কে বলেছিল আমি নিজে হাঁদা বানিয়ে রাখা কতগুলো ছেলেকে ওষুধ খাইয়ে বুদ্ধিমান বানিয়ে ধরে আনতে? তোমরা আমাকে

ঠকিয়েছ!'

ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল গাজুল আর মাজুল।

করজোড়ে বলল গাজুল, 'ভুল হয়ে গেছে, মালিক। এবারের মত মাফ করে দিন।'

ডক্টর মুন বললেন, 'ভাল করেই জানো তোমরা এখানকার নিয়ম। এখানে ভুলের কোন ক্ষমা নেই। বিজ্ঞান গবেষণায় সামান্যতম ভুলও বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে। তোমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখলে ভবিষ্যতে আরও বড় কোন ভুল করে বসবে। আমার ল্যাবরেটরিতে এ ধরনের রিস্ক আমি নিতে পারি না। কষ্ট করার ভয়ে হাতের কাছে পাওয়া বোকাদেরকে ওষুধ খাইয়ে যারা বুদ্ধিমান বানানোর চেষ্টা করে, তাদের মত অলসদের দিয়ে আমার কোন উপকার হবে না।'

ডেস্কের ড্রয়ারের দিকে ডান হাতটা নেমে গেল ডক্টর মুনের।

কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝে গিয়ে চিৎকার করে উঠল গাজুল, 'না না, মালিক, আর কোনদিন ভুল হবে না…'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই হাতটা বেরিয়ে এল আবার ডক্টর মুনের। হাতে একটা বড় পিস্তলের মত অস্ত্র। গাজুলের দিকে তাক করে টিপে দিলেন ট্রিগার। নলের মুখ থেকে বেরিয়ে এল একটা সাদা আলোকরশ্মি।

মুহূর্তে নেই হয়ে গেল গাজুল। সে যেখানে ছিল সেখানে টেনিস বলের সমান একটা রূপালী ধোঁয়ার কুণ্ডলী তৈরি হলো। ধীরে ধীরে উঠে যেতে লাগল ছাতের দিকে।

ঘুরে দরজার দিকে দৌড় মারল মাজুল।

কিন্তু দুই পা-ও যেতে পারল না। সাদা আলোকরশ্মি এসে লাগল তার পিঠে। চোখের পলকে গাজুলের অবস্থা হলো তারও।

হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল তিন গোয়েন্দা। ডক্টর মুন বাদে সবার চোখে আতঙ্ক দেখতে পেল।

অস্ত্রটা আবার ড্রয়ারে রেখে দিলেন ডক্টর মুন। প্রহরীদের বললেন, 'নিয়ে যাও এদের। টেকনিশিয়ানদের বলো, রক্ত বদলাক, কিংবা যত খুশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাক এদের ওপর। যদি কাজের উপযুক্ত করতে পারে, ভালো, নয়তো গায়েব করে দিক। হাবা দিয়ে আমাদের কোন কাজ হবে না। ওদের বাড়িতে ফেরত পাঠানোরও আর কোন যুক্তি নেই। যাও, নিয়ে যাও।'

তেইশ

আবার ক্লিনিং রূমে নিয়ে আসা হলো তিন গোয়েন্দাকে।

ঘরে ঢুকেই ঝাড়া দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল মুসা। কিশোরকে যে রোবটটা

ধরেছে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিশোরকে ছাড়ানোর পর দু'জনে মিলে রবিনকে ছাড়াল। তারপর দিল দৌড়।

আচমকা মুসাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে রবিনকে লক্ষ্য করে ডাইভ দিল কিশোর। তাকে সঙ্গে নিয়ে পড়ল মেঝেতে। ঠিক ওই মুহূর্তে দুটো সাদা আলোকরশ্মি ছুটে গেল ওদের মাথার ওপর দিয়ে। অল্পের জন্যে বাঁচল।

ঘাড় ফিরিয়ে মুসার কি অবস্থা দেখল কিশোর।

মুসাও উপুড় হয়ে শুয়ে আছে মাটিতে।

হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আবার ছুটতে শুরু করল ওরা। পালানোর পথ খুঁজছে।

কোন পথ দেখতে পেল না।

পালানোর কোন উপায় নেই।

একধারে জটলা করছে কয়েকজন রোবটমানব। সেদিকে গেলে ধরা পড়তে হবে নিশ্চিত।

এখানে থাকলে···

কিন্তু ভাবার সময় পেল না কিশোর। চিৎকার করে উঠল, 'সরে যাও!'

আবার তিনটে আলোকরশ্মি ছুটে এল ওদের দিকে। অল্পের জন্যে বাঁচল এবারও। কাঁধে আগুনের আঁচের প্রচণ্ড তাপ লাগল কিশোরের। রশ্মিটা সামান্য নিচে নামলেই গায়ে লাগত তার, হাওয়া হয়ে যেত সে।

'এদিকে দিয়ে এসো!' চিৎকার করে উঠল মুসা।

হতভম্ব একজন রোবট-টেকনিশিয়ানকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বাঁক নিয়ে কতগুলো বাক্সের পেছনে ঢুকে গেল সে। রবিন ছুটল তার পেছনে।

ক্ষণিকের জন্যে ফিরে তাকাল কিশোর। এগিয়ে আসছে তিন প্রহরী। ওদের হাতে লেজার-পিস্তল উদ্যত। কিন্তু ট্রিগার টিপতে সাহস পাচ্ছে না। কেন সেটা বোঝা যাচ্ছে। টিপলেই রশ্মি গিয়ে লাগবে কাঁচের বাক্সের গায়ে। হাওয়া হয়ে যাবে বাক্সে ভরে রাখা রোবটশিশুরা।

মুসা আর রবিনের মত কিশোরও কাজে লাগাল সুযোগটা। ছুটে বাক্সের পেছনে চলে এল।

দরজাটা চোখে পড়ল। সেদিকেই ছুটছে মুসা আর রবিন।

'বেরোনো যাবে ওটা দিয়ে?' পেছন থেকে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'চেষ্টা করে দেখা যাক। আর তো কোন উপায়ও নেই।' ছোটা বন্ধ করল না মুসা।

পেছনে কানে আসছে চিৎকার আর পদশব্দ। দরজার কাছে সময়মত পৌঁছতে পারবে কিনা বুঝতে পারল না কিশোর। ভারী দম নিল সে। তারপর প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল দরজাটার দিকে। ছোটাও কঠিন। আয়না বসানো মেঝেতে পিছলে যেতে চায় পা।

ওদের ধরতে না পারায় হই-হট্টগোল আর চিৎকার-চেঁচামেচি বেড়ে গেছে

কয়েকগুণ। দুপদাপ পা ফেলে ছুটে আসছে বহু লোক।

খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল মুসা আর রবিন। ওদের সামান্য পরেই কিশোরও বেরোল।

কানে এল মুসার চিৎকার। পরক্ষণেই রবিনের। দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেয়েছে মুসা। সামলাতে না পেরে তার গায়ের ওপর গিয়ে পড়েছে রবিন।

সামনে খোলা জায়গা নেই। দরজাও নেই।

মরিয়া হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'আলমারি! একটা আলমারিতে ঢুকেছি আমরা।'

তারমানে দরজাটা ছিল মস্ত আলমারির।

'আর কোন পথ নেই,' ককিয়ে উঠল রবিন। 'আটকা পড়লাম!'

আলমারির দেয়ালে রূপালী রঙের একটা হাতলের ওপর দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে কিশোরের। আচমকা হাত বাড়িয়ে হাতলটা ধরে হ্যাঁচকা টানে নিচে নামিয়ে দিল।

মুহূর্তে দু'দিক থেকে পিছলে সরে এসে লেগে গেল আলমারির দরজা। চালু হয়ে গেল আলমারি।

চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'আলমারি নয়, আলমারি নয়, কোন ধরনের লিফট।'

অনন্তকাল ধরে যেন নেমেই চলল লিফটটা। আসলেই চলছে কিনা যখন সন্দেহ হতে লাগল ওদের, ঠিক সেই সময় ঝাঁকি লাগল। স্থির হয়ে গেল লিফট। পিছলে দু'দিকে সরে গিয়ে আবার খুলে গেল দরজা।

লিফট থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

ফুটবল মাঠের সমান বিশাল একটা জায়গায় ঢুকল। কাঁচে ঢাকা মস্ত গম্বুজের মত ছাত। অসংখ্য গোলকযান দেখতে পেল সেখানে। সারি দিয়ে রাখা। হেলিকপ্টার কিংবা বিমান রাখার ছাউনির মতই এটা গোলকযান রাখার ছাউনি। গোলকগুলোর গায়ে নাম লেখা 'টাইম ট্র্যাভেল'। আলাদা করে বোঝার জন্যে নম্বর দেয়া রয়েছে, যেমন টাইম ট্র্যাভেল-১, টাইম ট্র্যাভেল-২, ইত্যাদি।

সেগুলোর দিকে ছুটল ওরা।

একটা গোলকের ওপর চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়াল রবিন। 'এই কিশোর, দেখো, আমাদেরটা না? নম্বর মিলে যাচ্ছে।'

নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর। গোলকযানটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সে-রকমই তো মনে হচ্ছে। আমাদের নয় ওটা, ডক্টর মুনের। তবে ওটাই নিয়ে গিয়ে লেকের পানিতে লুকিয়ে রেখেছিলাম আমরা।'

গোলকযানটার দিকে দৌড় দিল সে।

এ জিনিস চালানোর ওস্তাদ হয়ে গেছে এখন মুসা। দরজা খুলে উঠে পড়ল। কিশোর আর রবিন উঠে বসতেই লাগিয়ে দিল দরজাটা। প্রথমেই টিভি মনিটরটা অন করে দিল। ল্যাবরেটরির ভেতর থেকে ছুটে বেরোতে দেখল প্রহরীদের।

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, 'কোন সুইচটা টিপব? আজ আর ভুল করতে রাজি না।'

সেদিনকার কথাটা মনে পড়ে গেছে এখন তিনজনেরই। কিশোর বুঝতে

পারল, বুদ্ধি স্বাভাবিক হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হারানো স্মৃতিও ফেরত এসেছে। প্রচণ্ড গরম পড়েছিল সেদিন। মুসা প্রস্তাব দিয়েছিল, লেকের পাড় থেকে হাওয়া খেয়ে আসতে। কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকতেই গোলকযানটার কথা পাড়ল কিশোর। অনেকদিন চড়া হয় না। লেকের পানিতে লুকানো আছে। পানি থেকে তুলে চেপে বসেছিল ওটাতে ওরা। কিশোর প্রস্তাব দিয়েছিল, চড়াই যখন হলো, বেড়িয়ে আসা যাক। কিন্তু কোথায় বেড়াবে? অনেক সুইচের মধ্যে বড় একটা লাল সুইচ আছে। সেটাই টেপার সিদ্ধান্ত নিল। যা থাকে কপালে ভেবে ওই সুইচটাই টিপে দিয়েছিল। এবং তারপর তো কয়েক মাস ধরে চরম ভোগান্তি···এখানে আসার পর ডক্টর মুন ওদেরকে বোকা করে কাউকে সঙ্গে দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। নিজের গোলকযানটা রেখে দিয়েছিলেন এখানেই···

'আরে বলো না, কোনটা টিপব?' মুসার উত্তেজিত কণ্ঠ ভাবনার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল কিশোরকে। 'জলদি বলো! চলে এসেছে তো ওরা।'

নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটতে লাগল কিশোর। মনিটরের দিকে তাকিয়ে দেখল গোলকযানের কাছাকাছি চলে এসেছে প্রহরীরা। বলল, 'লালটাই টেপো আবার। টেলিভিশনের সুইচ অন-অফ করার মত মনে হচ্ছে জিনিসটা। একবার টিপলে অন, পরের বার টিপলে অফ। একবার টিপে ডক্টর মুনের হেডকোয়ার্টারে পৌঁছেছি, নিশ্চয় দ্বিতীয়বার টিপলে আগের জায়গায়–অর্থাৎ যেখান থেকে এসেছে সেই লেকের পানিতে ফিরে যাবে যানটা।'

'যদি না যায়? অন্য কিছু করে?' রবিন বলল।

'কিছুই করার নেই,' জবাব দিল কিশোর। 'এখানে থাকলেও মরতে হবে। তারচেয়ে চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি। ঝুঁকিটা নিতেই হবে।'

হাত বাড়াল মুসা।

একবার দ্বিধা করে টিপে দিল লাল সুইচটা।

কয়েকটা সেকেন্ড যেন কিছুই ঘটল না। তারপর একটা ঝাঁকুনি। মনিটরে দেখা গেল চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল প্রহরীরা। তারমানে গম্বুজ থেকে বেরিয়ে এসেছে গোলকযান।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রবিন বলল, 'ভাগ্যিস বোকার অভিনয় করার বুদ্ধিটা বের করেছিলে। আর কোনভাবেই ফাঁকি দেয়া যেত না ওদের।'

হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'আমার অভিনয়টা কেমন হয়েছে?'

'এত বাস্তব অভিনয় হলিউডের সবচেয়ে বড় অভিনেতারাও করতে পারবে কিনা সন্দেহ,' হেসে বলল কিশোর। 'ডক্টর মুন তো বটেই, গাজুল-মাজুলের মত রোবটমানবেরাও শেষ পর্যন্ত সেই ফাঁকিতে পড়ে গেল। এরচেয়ে ভাল অভিনয় আর কি হতে পারে?'

ঝপ করে পানিতে পড়ার শব্দ হলো একসময়। মনিটরে দেখতে পেল ওরা একটা পরিচিত লেক।

পানিতে ফাঁপা বলের মত ভেসে রইল গোলকযানটা।

নিরাপদেই রকি বীচে ফিরে এসেছে। কিন্তু বিশ্বাস হতে চাইছে না ওদের। শেষে দরজা খুলে উঁকি দিয়ে দেখে এল রবিন।

জরুরী কণ্ঠে কিশোর বলল, 'তাড়াতাড়ি এটা ডুবিয়ে দিয়ে চলো পালাই এখান থেকে। বলা যায় না, যে কোন মুহূর্তে টাইম ট্র্যাভেলার নিয়ে আমাদেরকে ধরতে হাজির হয়ে যেতে পারে ডক্টর মুনের রোবটবাহিনী। চলো চলো, জলদি করো!'

যানটাকে তীরের কাছাকাছি নিয়ে আসা হলো। সুইচ টিপে লম্বা মইয়ের মত সিঁড়ি বের করে তীরে ঠেকাল মুসা। নেমে পড়ল তিনজনে। বাকি কাজ এখন রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে সারতে হবে। পকেট থেকে ছোট্ট যন্ত্রটা বের করল কিশোর। গোলকযানের কন্ট্রোলবোর্ডের ওপরেই রাখা ছিল। নামার আগে পকেটে ভরেছে। সুইচ টিপে প্রথমে মই সরাল। তারপর দরজা বন্ধ করল। সবশেষে আরেকটা সুইচ টিপতেই নিঃশব্দে পানিতে তলিয়ে গেল যানটা।

দুই দিন পর।

স্কুলে হাজির হয়েছে তিন গোয়েন্দা।

মামলায় স্কুল কর্তৃপক্ষ হেরেছে। আবার ভর্তি করে নিতে বাধ্য হয়েছে তিনজনকে।

অংকের ক্লাসে একটা কঠিন সমীকরণ দিয়ে গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার ক্রেগ, 'কে করতে পারবে? মুসা, তুমি পারবে?'

মাথা নাড়ল মুসা, 'এত কঠিন অংক আমাকে দিয়ে হবে না, স্যার।'

অবাক হলেন মিস্টার ক্রেগ। রবিনের দিকে তাকালেন। 'তুমি পারবে?'

'চেষ্টা করে দেখতে পারি, স্যার।'

ব্ল্যাকবোর্ডে এসে চক দিয়ে অংকটা করল রবিন। ফিরে তাকাল মিস্টার ক্রেগের দিকে।

মাথা ঝাঁকালেন তিনি, 'ঠিক পথেই এগিয়েছিলে, কিন্তু দুটো জায়গায় ভুল রয়ে গেছে।' ক্লাসের দিকে তাকালেন তিনি। 'ভুল দুটো আর কেউ ধরতে পেরেছ? শুধরে দিতে পারবে?'

রয় বা শারিয়া কেউ জবাব দিল না। একমাত্র হাত তুলল কিশোর। সে এসে ঠিক করে দিয়ে গেল অংকটা।

হাসি ফুটল মিস্টার ক্রেগের মুখে। 'কি ব্যাপার? আজ মুসা পারলই না, রবিন ভুল করল, করতে পারলে কেবল তুমি। সেই আগের মত। ঘটনাটা কি?'

হেসে জবাব দিল কিশোর, 'আবার আমাদের মগজ স্বাভাবিক হয়ে গেছে, স্যার। প্রথমে মগজ ভোঁতা করার ওষুধ দিয়ে বোকা বানিয়ে দেয়া হয়েছিল আমাদের, তারপর মগজ উন্নত করার ওষুধ খেয়ে হয়ে গেলাম ক্ষতিকর রকম বুদ্ধিমান। দুটো ওষুধের পরস্পরবিরোধী রিঅ্যাকশনেই সম্ভবত আবার স্বাভাবিক

পর্যায়ে চলে এসেছে আমাদের মগজ। একেবারে আগের মত। অরিজিন্যাল আমরা।'

'পরস্পরবিরোধী রিঅ্যাকশনের ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।'

'ভাল ব্যাখ্যা আমিও দিতে পারব না, স্যার। তবে বিষে বিষক্ষয়ের মত হয়েছে ব্যাপারটা। এর সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভবত আঙ্কেল জ্যাক দিতে পারবেন।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার ক্রেগ। 'দেখি, একদিন মিস্টার জ্যাককেই গিয়ে ধরব। কি ওষুধ দিয়ে তিনি এই কাণ্ড করিয়েছেন, জানতে হবে। যাই হোক, আবার যে তোমাদেরকে আগের অবস্থায় ফিরে পেয়েছি, এতে আমি খুব খুশি।' ক্লাসের দিকে তাকালেন তিনি। 'তোমরা কি বলো?'

হাততালি দিয়ে মিস্টার ক্রেগের কথা সমর্থন করল সবাই।

***